পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়

সৈয়দ মুজতবা আলী

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৩৫২
দ্বিতীয় মুদ্রণ

প্রচ্ছদপট-অঙ্কন
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, [illegible]০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও [illegible]নারায়ণ ভট্টাচার্য, তাপসী প্রেস,
৩০ বিধান সরণী, কলিকা[illegible]৬ হইতে মুদ্রিত

প্রকাশকের ভূমিকা

'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' সম্ভবত লেখকের শেষতম রচনা। অন্তত আর কোন অপ্রকাশিত (গ্রন্থাকারে) রচনার সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই রচনার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি বাংলাদেশের 'পূর্বদেশ' নামীয় সংবাদপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এই রচনার প্রথম ও প্রধান বক্তব্য রাজনীতিতে সর্বথা সর্বদা পুরাতনই পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। যা আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন বলে মনে হয়, আসলে তা পুরাতনেরই বেশ-পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে লেখক আফগানিস্থান ও অনুরূপ দুর্বল দেশের পৃষ্ঠপটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ও মহাশক্তিগুলির রাজনীতি ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে তাঁর বক্তব্য সপ্রতিষ্ঠ করেছেন। বাংলাদেশে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তাঁর যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় পাকিস্তানের নেতাদের, বিশেষ করে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার রাজনীতিক মতলব কি ছিল তাদের কোথায় কোথায় মূর্খতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা তাঁর অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ দূর-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রন্থের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখকের রাজ-নৈতিক প্রজ্ঞা ও সরস লেখনীর যেন এক নূতন পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিবর্তনে
অপরিবর্তনীয়

একদা এক ফরাসীর সঙ্গে পেভমেণ্টের উপর শামিয়ানা-খাটানো কাফেতে বসে কফি খেতে খেতে রসালাপ করছি এমন সময় আমার পরিচিত এক ইংরেজ চেয়ার-টেবিল বাঁচিয়ে এগুচ্ছে দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলুম। ফরাসীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললুম, "ইনি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট— অনার্স।" ফরাসী পরম আপ্যায়িত হয়ে উৎসাহভরে শুধালো, "কোন সাবজেক্টে, মসিয়োঁ? হকি না টেনিসে?" ফরাসী মাত্রই বিশ্বাস, পড়াশুনা বাবদে ইংরেজ এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর মুগ্ধকণ্ঠে বললে, "ধন্যি জাত, মসিয়ো। খেলাধুলা বিশেষ করে ক্রিকেট -যেটাকে ওদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম (জাতীয় চিত্তবিনোদন) বলা যেতে পারে—সেটাকে তুলে নিয়েছে শিক্ষাদীক্ষার উচ্চ পর্যায়ে। আপনাদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম কি, মসিয়ো?" আমি ঈষৎ চিন্তা করে বললুম, "আসনপিঁড়ি হয়ে বসে, পা'সুদ্ধ জানু ঘন ঘন দোলানো। বাচ্চারা বেঞ্চিতে বসে দুটো পা-ই। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, ওদের জানু, পা'তে দড়ি বেঁধে পাওয়ার তৈরী করলে তাবৎ দেশের বিজলি-সাপ্লাই পাওয়া যাবে।" ফরাসী বললে, "ওটা তো নিতান্তই হার্মলেস, নির্বিষ। শুনেছি জর্মানদের ন্যাশনাল প্যাসটাইম, বিশ-ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর একটা বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া।" আমি প্রতিবাদ মুদ্রা দেখবার তরে ডান হাত দিয়ে এক কোপে সামনের বাতাস দু'টুকরো করে কেটে দিয়ে বললুম, "নস্যি, নস্যি মসিয়ে, বিলকুল ধূলিপরিমাণ! আফগানিস্তানের নাম শুনেছেন? সেখানে কওমে কওমে ধনাধন্ গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি করে দু'দশ জনকে খতম করে দেওয়া তো নিত্যদিনের ওয়ারজিস, জিমনাসটিক্। আর তাবৎ মুল্লুক জুড়ে লড়াই, এক বাদশাকে তখ্‌ৎ থেকে হটিয়ে অন্য বাদশা বসানো—যদিও তারা বিলক্ষণ জানে, তাতে করে ফায়দা হবে না আদৌ, কুল্লে 'পিদর-সুখতেই' (পিতৃদহনকারী, কুট্টি ভাষায় সব হা-ই) বরাবর, সোওয়াদ পাল্টাবার তরে একবার একটা ডাকুকে এস্তেক এস্তেমাল করে তজরুবাভী করেছে—এসব মুল্লুক-জোড়া প্যাসটাইমে ভদ্র আফগান মাত্রই মশগুল হয় বছর পাঁচেক অন্তর অন্তর।"

ফরাসী এক গাল হেসে বললে, "আমরা যে রকম ৩১শে ডিসেম্বরের দুপুর রাতে গির্জেয় গির্জেয় ঘণ্টা বাজিয়ে ফি বছর পূর্ণা সালটাকে ঝেঁটিয়ে খেদিয়ে দিয়ে নয়া একটা নিয়ে আসি। কেন, বাওয়া, পুরনোটা কী-ই বা এমন অপকর্ম করেছিল? দিব্য ঐ দিয়ে কাজ চলছিল না? তাও, মসিয়ো বুঝতুম,

নম্বরটাকে যদি বছর-বিশেকের গ্যারান্টি সহ আমদানি করতো! সেটাকে ফের ঝেঁটা!”

আমি গদগদ কণ্ঠে বললুম, “তাই না বেবাক মুল্লুকের সাকুল্যে লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে হেথায়, এই প্যারিসে ঝামেলা লাগায়। তোমরা সব-কুচ চটসে সমঝে যাও।”

আরেক গাল হেসে বললে, “তা আর জানবো না? ফ্রেন্স রিভলুশনে রাজা থেকে আরম্ভ করে নিত্যি নিত্যি কত না মুণ্ডু কেটেছি—কিন্তু মাইরি, রাজারও তো মাত্র একটা মুণ্ডু, সেটা কাটা গেলে, ইতিহাস সেটা নিয়ে আসমান-জমীন ফাটায় কেন? আমরা জানবো না তো জানবে কে?”… ফরাসী সরেস মন্তব্য শুনে আম্মো ভাবি, কাবুলী বাদশার মুণ্ডুটা তো পার্মেনেণ্ট এড্রেসেই রয়েছে। তবে অত ধানাই পানাই ক্যান?

রইবে শুধু তাস

আর এক রাজার সর্বনাশ

(প্রাক্তন) রাজা ফারুক নাকি একদা রাজসিক একটি আপ্তবাক্য ছেড়েছিলেন, “এই দুনিয়ায় একদিন টিকে থাকবেন শুধু পাঁচজন রাজা। তাসের চারটি আর ইংল্যাণ্ডের রাজা—একুনে পাঁচ, ব্যাস।” জানি, রাজার কথা সব কথার রাজা। তা সে রাজার মুখ থেকে বেরনো কথাই হোক, আর রাজা নিয়ে রূপকথাই হোক।

কিন্তু, পাপ-মুখে কি করে কই, পেত্যয় যেতে মন যেন চাইছে না, মিসর রাজের ক্রমশঃ-প্রকাশ ভবিষ্যৎবাণী সত্যই কি কাবুলী-মেওয়া রূপে প্রকাশ পেল? কাবুলে গণতন্ত্র! ডাকুহীন, রাজাহীন কাবুল! প্রকাশ, আলা হজরত পাদিশাহ ই দীন ওয়া দুনিয়া আগা ই আগা বাদশাহ মুহম্মদ জহির শাহ, জীদ আজলালাহু দামৎ শওকতোহু ওয়া ইকবালোহু—তাঁর গৌরব বর্ধমান হোক, তাঁর শৎকৎ এবং শ্রীসৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক—আমি সংক্ষেপে সেরে, আশা করি কোন অলঙ্ঘ্য প্রোটোকল অমান্য করে সখৎ গুনাহ বা মোলায়েম মকরূহ-এ লিপ্ত হই নি—তাঁর তাজ ও তখৎ হারিয়েছেন। অতএব আমরা ফারুকের ভবিষ্যৎবাণী মাফিক আখেরী পঞ্চরাজ-চক্রবর্তীর আরো নিকটবর্তী হয়েছি। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু এ তো অতিশয় পুরনো কাসুন্দী। তথাকথিত ঐতিহাসিক টয়েনবি যাকে বলেন প্যাটার্ন। না,

এবারে যে গাজী—কালক্রমে ইনি গাজী উপাধি অবশ্যই পাবেন—তখৎ-তাজ কেড়ে নিলেন তিনি নাকি সেগুলো এস্তেমাল করবেন না। তিনি দেশের জন্য, তাঁর কথায় 'ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী' গণতন্ত্র ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু কিঞ্চিত অবান্তর হলেও যে প্রশ্নটা প্রাগুক্ত ফরাসিসও আজ জিজ্ঞেস করতেন সেটা সংক্ষেপে বললে দাঁড়ায়, "এত ল্যাটে কেন?" ১৯৩৩-এ জহির শাহ উনিশ বছর বয়সে রাজা হন। তাঁর পিতা বাদশা নাদির শাহ আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। আফগানরা সেই শেষ জাতীয় চিত্তবিনোদনের পর ঝাড়া চল্লিশটি বছর ধরে এই মহামূল্যবান প্রতিষ্ঠানটিকে এ-রকম নির্মম বেদরদ পদ্ধতিতে অবহেলা করলো কেন? আফগান চরিত্র যাঁরা কণামাত্র চেনেন তাঁদের কাছে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ভূতুড়ে ব্যাপার, বেআইনী তিলিসমাৎ বলে মনে হবে।

এর মোদ্দাটা আমাদের সোনার বাংলার একটি প্রবাদে অনায়াস-লভ্য। 'একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ি, তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।' পাঠান-আফগানরা নাচবার তরে হরহামেশা তৈরী, কিন্তু ঐ যে মৃদঙ্গটা ওতে দু'চারটে চাটিম চাটিম বোল তুললে তবে তো মৌজটা জমে এবং সে মৃদঙ্গ বাজাতেন আকছারই ইংরেজ মহাপ্রভুরা পেশোয়ারে বসে। ১৯১৭-এর পূর্বে কখনো বা রাশার জার—আমু দরিয়ার ওপারে বসে। এনরা নাচবার তরে কড়ি ভী দিতেন, নাচের সময় শাবাশী দিতেন, নাচ শেষে আপন আপন পছন্দসই 'আমির'-কে তখ্‌তে বসাতেন। শেষবারের মত ডুগডুগি বাজিয়েছিল ইংরেজ ১৯২৮।২৯-এ। নাদির শাহকে মারার পিছনে কেউ ছিল কিনা, সঠিক বলতে পারবো না।

পটভূমি

আমান উল্লা যখন দেশের তরে লড়াই দেন, তখন তাঁর জঙ্গী লাট ছিলেন নাদির খান। স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেই, যে কোনো কারণেই হোক তাঁর মনে নাদিরের মৎলব সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হল, লোকটা আফগান ফৌজের এতই প্যারা যে, কখন যে একটা মিলিটারি কু লাগিয়ে নিজেই রাজা হয়ে বসবে না, তার কি প্রত্যয়! আমান উল্লা নিজেই তো রাজা হলেন সৎ ভাই, যুবরাজ এনায়েত উল্লাকে তাঁর হক্কের তখ্‌ৎ থেকে বঞ্চিত করে—যদিও সমস্ত ষড়যন্ত্র বলুন, প্যাস্‌টাইম বলুন, ব্যাপারটার পরিপাটি ব্যবস্থা করেছিলেন

তাঁর আত্মাজ্ঞান,—আমান উল্লার পেটে কতখানি এলেম ছিল সে তারিফ তাঁর পরম প্যারা দোস্ত তক করতে গেলে বিষম খেত। কিন্তু তার চেয়ে একটা মোক্ষমতর তত্ত্ব আছে, সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি বাবদে। আর্যদের ভিতর বহু প্রাচীনকাল থেকেই একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে—পিতা গত হলে বড় ছেলে পরিবারের কর্তা হবে। কোনো কোনো আর্য গোষ্ঠীতে তো সে আইন এমনি কট্টর যে, বড় ছেলে ভিন্ন অন্য ভাইরা পিতার সম্পত্তির কানা কড়িটাও পায় না, গ্রাসাচ্ছাদনও না। সর্ব ব্যবস্থার মত এ ব্যবস্থাটারও সদ-গুণ বদ-গুণ দুইই আছে। কিন্তু আফগানদের ভিতর সে আইন খুব একটা চালু হয় নি। আমান উল্লা নাদিরকে বিদেশে চালান দিয়েছিলেন।

লাঠি যার দেশ তার

কাবুলের সিংহাসনে বসার হক্ক শেষটায় বংশানুক্রমে গিয়ে দাঁড়ায় মূলতঃ কান্দাহারের আব্দুর রহমান, হবীব উল্লা, আমান উল্লার গোষ্ঠীতে। তার অর্থ ঐ গোষ্ঠীর 'যার লাঠি তার মোষ'। আমান উল্লা, নাদির, জহির আর আজকের জেনারেল মুহম্মদ দাউদ খান সক্কলেরই যে কেউ গায়ের জোরে একবার কাবুলের তখ্‌তে বসে যেতে পারলে, ক্রমে ক্রমে জালালাবাদ, গজনী, কান্দাহার শায়েস্তা করে তাঁবেতে আনতে পারলে তাবৎ আফগানিস্তান তাঁকে আলা-হজরত বাদশাহ বলে মেনে নেয়। কাতাখান-বদখশান মজার-ই-শরীফের বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য নেই।

উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি, জেনারেল দাউদ মাত্র কাবুলের প্রধান। সদরও বলতে পারেন। বেতার বলছে, কাবুলের বাইরে এখনো তাঁর রাজ্যবিস্তার আরম্ভ হয় নি। তবে কাবুল উপত্যকার বাইরে উত্তর দিকে, অন্তত মাইল দশ পনেরো দূরের একটা জায়গা (চল্লিশ বছর হয়ে গেল, নামটা ঠিক মনে নেই, খুব সম্ভব জাবাল উস্‌-সরাজ) থেকে আসে বিজলি। সেটা নিশ্চয়ই জেনারেল দাউদের তাঁবেতে। নইলে সিমলে পাহাড় থেকে কাবুল বেতারে দাউদের জয়ধ্বনি আকাশবাণীর মনিটর শুনলো কি করে?

ওদিকে যদিও কাবুল বিমান বন্দর একেবারে শহরের গা ঘেঁষে তবু বিলেত ছেড়ে কাবুলে যে প্লেন আসছিল সেটা সোজা দিল্লী চলে গেল কেন? লাহোর কিংবা করাচীতেই নামলো না কেন? হয়তো প্লেনে রাজ পরিবারের দু'চারজন, কিংবা এবং জহিরপন্থী কিছু লোক ছিলেন যাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষে

কাবুল যাওয়াটা মোটেই নিরাপদ নয়। পাকিস্তানে নামাটাও খুব সুবুদ্ধিমানের কাজ হত না। ভারতের সঙ্গে আফগানিস্তানের কোনো দুশমনী নেই। ভারতই ভাল। কাবুল এ্যার-পর্টে নামাটা টেকনিক্যালী সম্ভবপর হলেও।

বহুকাল হল কাবুল বেতার শুনি নি। একদা সন্ধ্যে সাতটা আটটা থেকেই বিদেশের জন্য তাদের প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যেত, পশতু এবং ফার্সীতে। রাত এগারোটার ঝোঁকে ইংরেজীতে, এবং পিঠ পিঠ ফরাসীতে। দেখি, রাত ঘনালে পাই কি না। তবে 'কু দেতা', বা 'কু দ্য পালে' হয়ে যাওয়ার পর নানা কারণে সচরাচর জোরদার ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয় না বা যায় না।

অর্থই পরমার্থ

কার্ল মার্কস বলেছেন, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন ইহ-সংসারে কোনো বিরাট পরিবর্তন হয় না। ইংরেজ এই নীতি অবলম্বন করে তার ন্যাশনাল প্যাস্‌টাইম—'জাতীয় চিত্তবিনোদন' প্রতিষ্ঠান, ফুটবল-ক্রিকেটকে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অক্সফর্ড কেমব্রিজে সমাসন স্থলবিশেষে উচ্চাসন দিয়ে যে অত্যদ্ভুত সমন্বয় সাধন করলো তারই অর্ধশিক্ষিত-অর্ধমল্লবীর সন্তানগণ স্থাপন করলো বিশ্ব জোড়া রাশি রাশি উপনিবেশ্। কন্টিনেন্টের তাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ামোদ তার চতুঃসীমানায় প্রবেশ করতে দিত না। অতএব উপনিবেশ স্থাপন ও তথায় রাজত্ব করার জন্য শিক্ষিত লোক পাঠালে তারা মরতো পটাপট করে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ৎসে ৎসে ফীভার ইত্যাদি নানাবিধ রোগে; পক্ষান্তরে আখড়া থেকে ধরে ধরে ডানপিটে গাট্টাগোট্টাদের পাঠালে তারা পট পট পটল তুলতো না বটে, কিন্তু পটল ক্ষেতের হিসেব-নিকেশ থেকে আরম্ভ করে উপনিবেশের বাজেট, অডিট, আইন-কানুন, এক কথায় দেশ শোষণ করার জন্য যে সিভিল সার্ভিস গড়ে তুলতে হয় তার জন্য নিরঙ্কুশ অনুপযুক্ত। কেউ কেউ তো নামটা পর্যন্ত সই করতে পারতো না।

তাই ইংরেজ গলফ্ খেলার সময়ই হোক আর রিলেটিভিটি কপচাবার ওক্তেই হোক সব কিছু মা-লক্ষ্মীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

পাঠানের বর্ণচোরা সংস্করণের নাম ইংরেজ। পাঠানও তার ন্যাশনাল প্যাসটাইম—দু'দশ বছর পর পর কাবুলের তখ্‌ৎ থেকে পুরানো বাদশাকে

সরিয়ে নয়া বাদশা বসানোর জাতীয় চিত্তবিনোদনের সময় মার্কস-নির্দিষ্ট নীতি, ইংরেজ কর্তৃক হাতে-কলমে তার ফলপ্রাপ্তি, কোনটাই ভোলে না।

"বিআ ব্-কাবুল, বরওম ব্-কাবুল,
বিআ ব্-কাবুল ব্রওয়ীম ব্ কাবুল॥
আয় তুই কাবুল, আমি চললাম কাবুল,
আয় তুই কাবুল আমরা চলি কাবুল॥"

"দীন্ দীন্" রবে হুহুঙ্কার চিৎকার পাঠানের কাছে বিলকুল ফজুল। কাবুল লুট করাতে কি আনন্দ কি আনন্দ!

ন্যাশনাল প্যাস্টাইমের সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির সমন্বয়।

দো-নালা বন্দুক

প্রেসিডেণ্ট দাউদ খানের সর্বপ্রধান শিরঃপীড়া হবে এই পাঠান ডাকুর পাল। ওদের সামলাতে হলে দরকার ফৌজ। দাউদ খান তাঁর ভাষণারম্ভে সম্বোধন জানিয়েছেন পেট্রিয়টদের, 'দেশপ্রেমিকদের'—ফার্সীতে 'দোস্তান-ই-মুলক' বা সমাসবদ্ধ 'ইয়ার-উল-মুল্ক, কিংবা আরব্য রজনীর 'শহর-ইয়ার'-এর ওজনে 'মুল্ক-ইয়ার' অথবা সাদামাটা 'হম্ ওয়াত্ন' 'স্বদেশবাসী' যা-ই বলে থাকুন না কেন, পাঠান-হৃদয়ে আফগানিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি কোনো প্রকারের খাস, দিল-তোড়্ মহব্বতের কোনো নিশান আমি দেখি নি। যে অঞ্চলে সে বাস করে অর্থাৎ কওমী এলাকার প্রতি তার টান থাকা অসম্ভব নয়—পাখিটাও তার নীড়ের শাখাটির মঙ্গল কামনা করে—কিন্তু দেশপ্রেম! অতএব দেশ-প্রেমী দাউদ দেশের দোহাই দিয়েছেন দোনালা বন্দুকের মত। কাবুল ও কাবুলাঞ্চলের সরকারী ফৌজ যেন তাঁর কাছ থেকে বড্ড বেশী টাকা-কড়ি না চায়। কাবুলের ভিতরকার আর্ক-দুর্গের তোষাখানায় কি পরিমাণ অর্থ তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁর প্রথম ভাষণেই ফাঁস করে দেবেন এমনতরো দুরাশা তাঁর নব-নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীও করবেন না। এবং এটাও অসম্ভব নয় যে, জহির শাহ ভিন-দেশ যাবার মুখে বাগ-ই-বালার (আমাদের তেজগাঁও) কেন্দ্রীয় শাহী সৈন্যদের কমাণ্ডাণ্ট আপন দামাদ জেনারেল শাহ ওয়ালী খানের হেপাজতে গ্যারিসনের মধ্যেই রেখে গিয়েছিলেন। বলা শক্ত মানুষ আপন দামাদ, না ভগ্নীপতি, কাকে বেশী বিশ্বাস করে? খবর এসেছে, জেনারেল ওয়ালীকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। সেটা নিশ্চয়ই গ্যারিসন জয় করার পূর্বে দাউদের

দ্বারা সম্ভব হয় নি। হঠাৎ করে দাউদ ওটাকে জয় করার মত ফৌজ আর হাতিয়ার পাবেন কোথায়? এবং আর্ক-দুর্গই বা তিনি কাবু করলেন কি করে? সেখানে তো তাঁর বাস করার কথা নয়।

দাউদের পূর্বকথা

আফগান রাজনীতিতে বলা উচিত ছিল কাবুলের রাজনৈতিক দলাদলির প্রধান নেতা রাজ-গোষ্ঠীর সরদারগণ। দাউদ এদেরই একজন। জহির রাজা হন ১৯৩৩-এ। দাউদ তাঁর প্রধান মন্ত্রী হন ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে। অনুমান করা অসঙ্গত নয়, তিনি কুড়ি বৎসর ধরে তাঁর শক্তি সঞ্চয় করে চলছিলেন অর্থাৎ সরদারদের মধ্যে যে ক'জনকে পারেন আপন দলে টানছিলেন। এটা যে প্রকাশ্যে তখ্‌ৎ-নশীন বাদশার বিরুদ্ধে করা হয় তা নয়। গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান মেনে নিয়ে প্রত্যেক পলিটিশিয়ান যে রকম আপন দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে হুবহু সেই রকম কাউকে দলের উচ্চাদর্শ দেখিয়ে, কাউকে মন্ত্রিত্বের ওয়াদা দিয়ে, কাউকে বা ডাঁই ডাঁই কণ্ট্রাক্টের লোভ দেখিয়ে ইত্যাদি। কোনো সরদার যদি সত্যই পালের মধ্যে বড্ড বেশী জোরদার হয়ে যান, তবে বাদশা যে ঈষৎ শঙ্কিত হন সেটাও জানা কথা। তখন তাঁকে নিতান্ত নিজস্ব আপন দলে টানার জন্য বাদশা তাঁর বোন বা মেয়েকে সেই সরদারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হন। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমির হবীবউল্লা যখন দেখলেন, মোল্লাদের চিত্তজয় করে তাঁর অনুজ নসরউল্লা এত বেশী তেজীয়ান হয়ে গিয়েছেন যে তিনি রীতিমত শঙ্কিত হলেন—তাঁর মৃত্যুর পর আপন পুত্র যুবরাজ ইনায়েৎউল্লা হয়তো রাজা হতে পারবেন না, রাজা হয়ে যাবেন নসরউল্লা। তাই তিনি যুবরাজকে বিয়ে দিতে চাইলেন নসর কন্যার সঙ্গে। নসর হয়তো বা আপন দামাদকে খুন করতে ইতস্তত: করবেন—ঐ ছিল তাঁর গোপন আশা।…এ স্থলে, যদিও টায় টায় খাটে না, তবু হয়তো বা দাউদকে আপন দলে টানবার জন্য জহির বোনকে আদমের আপেলের মত তাঁর সম্মুখে ধরলেন। বস্তুতঃ আফগান রাজগোষ্ঠীর হতভাগিনী কুমারীকুল সে দেশের রাজনৈতিক দাবা খেলায় বড়ের মতই এগিয়ে গিয়ে ছকের মাঝখানে প্রাণ দেন, রাজার দুর্গ অভেদ্যতর করার জন্য (কাসলিং)। কেউ কেউ আমৃত্যু কুমারীই থেকে যান—ক্রীড়ারম্ভে যে ছকে জন্মগত অধিকার বা কিস্মত বশত তাঁকে দাঁড় করানো হয়েছিল কিস্তিমাৎ পর্যন্ত সেখানেই অর্থহীন

নিষ্কর্মার মত অবশ অচল হয়ে থাকেন। ষাট বছরের বুড়ো সরদারের সঙ্গে চৌদ্দ বছরের কচি মেয়ের বিয়ে হওয়াটাও আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু উপস্থিত থাক সে দীর্ঘ দয়াধর্মহীন কাহিনী। শুধু বাদশার নয়, কুল্লে সরদার-বালাদের ঐ একই হাল।

পট বদল

১৯৭৭-এ হঠাৎ ইংরেজের পরিবর্তে দেখা দিল পাকিস্তান। আমানউল্লা ইংরেজ এবং রুশ দুই সপত্নের (সপত্নীর পুংলিঙ্গ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে সপত্ন—মডার্ণ কবিদের ভাষায় "পুং-সতীন") মাঝখানে ছিলেন মোটামুটি ভালই। আখেরের নতীজা—সে কাহিনী প্রাচীন ও দীর্ঘ।...বাদশা জহির হঠাৎ দেখেন তাগড়া ইংরেজ সপত্নের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাকিস্তান—সেও আবার কাবুলের সঙ্গে ফ্লার্ট করা দূরে থাক ইণ্ডিয়া নিয়ে সে ব্যতিব্যস্ত। খুদ বাদশার কি মতিগতি ছিল জানিনে, কিন্তু সরদার দাউদ হয়ে দাঁড়ালেন পয়লা নম্বরের চেম্পিয়ন, পাঠানদের তাতিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে কামড় মেরে এক খাবলা গোশ্‌ত্ ফোকটে মেরে দিতে। তাঁর দল হল আরো ভারি। "বিআব-পেশাওয়ার" "চলি, চলো পেশাওয়ার/চে খুব উমদা সে-ভাণ্ডার।"

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ রকম একটা জিগির চিত্তহারিণী হবেই। পেশাওয়ারে খাস পাঠানদের বাড়ী-গাড়ী অত্যল্পই। পাঞ্জাবীরা সেখানে বিস্তর ধনদৌলত সঞ্চয় করেছে পার্টিশনের সময় বেধড়ক লুট করে। এবারে পাঞ্জাবী মৌমাছিদের খেদিয়ে দিয়ে বাড়ী আনতে হবে ইয়াব্বড়া বড়া মধু ভাণ্ড! আজ সদর দাউদ খাইবার পাস থেকে শুরু করে জালালাবাদ, সিমলা, খাক-ই-জব্বার তক সব "দেশপ্রেমী" পাঠানদের যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন সেটা কিঞ্চিৎ বঙ্কিম হলেও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কাবুলে বাদশা-বদল হলে ঐ সব অঞ্চলের যে পাঠানরা এক জোট হয়ে ধাওয়া করে জালালাবাদ লুটতে—দাউদ তাদের বলছেন, "হে দেশপ্রেমী পাঠান, তুমি আপন দেশ লুটতে যাবে কেন? তোমাকে তো বলেছি, পাকিস্তানের সঙ্গে, আমার যে বোঝাপড়া এতদিন তোমাদের ঐ নিষ্কর্মা জহিরের জন্য মুলতুবি ছিল, এখন সে শুভ-লগ্ন উপস্থিত। তোমার কম্পাসের কাঁটাটা ঘুরিয়ে দাও।" ভালো-মন্দের কথা হচ্ছে না; এটা সহজ পলিটিক্স। বেতারে শুনতে পেলুম, দাউদ প্রেসিডেণ্ট হয়েই বিদেশী রাজদূতদের ডেকে পাঠান—নিদেন প্রেসিডেণ্টের তখ্‌তে না বসা পর্যন্ত ওঁদের ডাকা যায় না—এবং তাঁদের শান্তি

শান্তি, সালাম ইয়া সালাম, সর্ববিশ্বে শান্তি এই বাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, "কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে এইবারে আমার বোঝাপড়া শুরু হবে।" বেতারের রিপোর্টার মন্তব্য করেছেন, প্রেসিডেন্টের বলার ধরনটা আদৌ স্নেহ্-সন্ধি সূচক ছিল না (আমি নিজে ধরনটার গুরুত্ব অত বেশী দিই নে ; কে না জানে, মানুষ রান্নার সময় যে গরমে ভাত ফোটায়, অতখানি গরমা-গরম গেলে না)।

এই মামুলী লেখনের গোড়াতে যে দোনালা বন্দুকের উল্লেখ করেছিলুম, এই তার দোসরা নাল।

কিন্তু পাকিস্তান যে ইসলামী রাষ্ট্র? আমরা পাকিস্তান আফগানিস্তান কোনো রাষ্ট্রেরই অমঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু দাউদ কি উত্তর দেবেন সেটা কিঞ্চিৎ অনুমান করতে পারি। জালালাবাদ অঞ্চলের পাঠানদের চাপে পড়ে—যদিচ সেটাই একমাত্র চাপ ছিল না—একদা আমান উল্লার তখ্‌ৎ যায়। এখন এরা যদি—অবশ্য সেটা অনুমান মাত্র—জেনারেল দাউদকে সমর্থন না করে তবে তাঁর তো গত্যন্তর নেই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁকে তখন কট্টরস্য কট্টর সুন্নী পাঠানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে হবে, "পাকিস্তানের সদর (শব্দার্থে বক্ষস্থল), ডিক্টেটর কে, যার হুকুমে তামাম পাকিস্তান ওঠ-বস করে? স্বৈরতন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। সে তো শিয়া।"

নজীর স্বরূপ আরেকটা তথ্য সদর দাউদ বলবার হক্ক ধরেন। তিনি বলতে পারেন, "১৯১৮ সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী তখন পাকিস্তানের যে সদর ইসকন্দর মির্জা আমাদের সঙ্গে স্নেহ করতে চেয়েছিল, সে কথাবার্তা বলেছিল কার সঙ্গে? বাদশা জহিরের সঙ্গে। আমি কথাই বলি নি। কেন? সেও ছিল শিয়া। তারও একটুখানি পরে কে? ইয়াহিয়া। সেও শিয়া।"

মুশকিল !!

*

* *

কু দে'তা মূলত ফরাসী। কু=আঘাত, গুঁতো; দ্য-ইংরিজি অব; এতা=রাষ্ট্র, ইংরিজি স্টেট ঐ একই শব্দ। অকস্মাৎ, বলপ্রয়োগ করে, সচরাচর দেশের সংবিধান বা ঐতিহ্য উপেক্ষা করে যদি এক রাজার বদলে আরেক রাজা তখতে বসে যান, কিংবা রাজাকে হটিয়ে গণতন্ত্র, অথবা গণতন্ত্রকে হটিয়ে স্বৈরতন্ত্র (ডিক্টেটরী) পত্তন করেন তবে সেই বলপ্রয়োগ (কু) দ্বারা রাষ্ট্রের

(এতা) রূপ বা ভাগ্য পরিবর্তনের নাম কু দে'ত। দেশ-বিভাগের পর সর্ব-প্রথম একটা কু দে'তার পূর্বাভাস দেন আধ-সেদ্ধ ডিক্টেটর ইসকন্দর মির্জা, আসল সুসিদ্ধ কু করলেন আইয়ুব। তাঁর পরের মাল সব ঝুট। ভুট্টো যদি মিলিটারী জুন্তাকে নির্মূল করে যা-ইচ্ছা-তাই বা যাচ্ছেতাই করতে পারেন তবে সেটা হবে তাঁর ব্যক্তিগত কু।

কু দ্য পালে রাজ-প্রাসাদের (পালে, পেলেস, প্রাসাদ) ভিতরকার আকস্মিক পরিবর্তন। কু দ্য পালে প্রতিষ্ঠানটি অতিশয় প্রাচীন, কিন্তু বাকাটি প্রচলিত হয়েছে হালফিল। একদা যে কোনো ব্যক্তি রাজাকে গুম খুন করে দুম করে সিংহাসনে বসে যেতে পারলেই দেশের লোক গড়িমসি না করে তাঁকে রাজা বলে মেনে নিত। এখন অত সহজে হয় না। রাজা ফারুককে হটানো-টার আরম্ভ হয় কু দ্য পালে দিয়ে, কিন্তু নজীব-নাসিরের পিছনে দেশের (এতা-র) লোক ছিল বলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে কু দে'তা-তে পরিবর্তিত হয়।

অতএব কু দে'তা বিরাটতর রাষ্ট্রবিপ্লব কু দ্য পালের চেয়ে।

জেনারেল দাউদ যে কর্মটি সমাধান করলেন সেটা স্পষ্টত কু দ্য পালে দিয়ে আরম্ভ; এখন যদি সেটা কু দে'তাতে পরিবর্তিত না হয় তবে বেশ কিছুকাল ধরে চলবে অরাজকতা, অর্থাৎ রাষ্ট্র-শক্তিধারীহীন রাষ্ট্রবিপ্লব বা সিভিল উয়ার। ইহ-সংসারে যত প্রকারের যুদ্ধ হয়, কোনো দেশের কিস্মত ভাণ্ডারে যত রকমের গজব আছে, তার নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতম উদাহরণ ভ্রাতৃ-যুদ্ধ।

চাণক্য বলেছেন, যে ব্যক্তি উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে (যখন পুলিশ কাউকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়) এবং সর্বশেষে বন্ধুকে শ্মশানে বয়ে নিয়ে যায়, সে-ই প্রকৃত বান্ধব।

"উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধব॥"

দোস্ত কুজা আস্ত্ ?

মিত্র কুত্র অস্তি ?

দোস্ত কোথায় আছে ?

অতএব উল্লেখ নিতান্তই বাহুল্য, যে, সদর দাউদকে বন্ধুর সন্ধানে—ব্ তলাশে দোস্ত—বেরুতে হবে। ভ্রাতৃযুদ্ধের সময় বান্ধবের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। ওদিকে সম্ভাব্য বান্ধবরা নব রাষ্ট্রনেতাকে বাজিয়ে দেখতে চান, তিনি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবেন কিনা। পূর্বেই বলেছি, কাবুলের কর্ণধার হলেই যে তিনি তাবত আফগানিস্থানের প্রভু হতে পারবেন, এমন কোনো কথা

নেই। অতএব আফগানিস্থানের সঙ্গে যে সব রাষ্ট্রের স্বার্থ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে বিজড়িত তারা সদর দাউদের নূতন রাষ্ট্রকে পত্রপাঠ ঝটপট স্বীকৃতি দেবার পূর্বে কান্দাহার, গজনী, জালালাবাদ তাঁর বশ্যতা মেনে নিয়েছে কি না, না মেনে থাকলে সেগুলোকে শায়েস্তা করবার মত তাঁর সৈন্যবল, অস্ত্রবল, অর্থবল পর্যাপ্ত কিনা তারই সন্ধান নেবে। ওদিকে, বলতে গেলে সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কাবুল এই সব এলেকা থেকে বিচ্ছিন্ন। যে সব রাষ্ট্র আফগানিস্থানের প্রতিবেশী, যেমন রুশ, ইরান, পাকিস্তান—এরাও এ সব এলেকার কোনো পাকা খবর পাচ্ছেন না।

তৎসত্ত্বেও বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ রুশের মত রাষ্ট্র, যার "ওরিয়েণ্টাল ধর্ম" শত শত বৎসর ধরে বিশ্বময় সুপরিচিত, এস্তুক দশক দুত্তিন পূর্বে হিটলার চেম্বারলেন উভয়কে প্রায় উন্মাদাশ্রমে পাঠাবার মত বাতাবরণের সৃষ্টি করে তুলেছিল আর দানির কেষ্ট বিষ্ণু, রাজনীতির ইস্কুলে নিতান্তই 'তিফল-ই মকৃতববৎ' চ্যাংড়া, যাদের কোনো কিছুতেই তর সয় না, রাতারাতি চৌষট্টি-তলার এমারৎ নির্মাণ যাদের কাছে ডাল-ভাত—থুড়ি, হট-ডগ হাম-বুর্গার—সেই নিকসন কিসিংজারকে পকেটে পুরেছে যারা, তারা কিনা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, প্রতিবেশী কুল্লে মুল্লুককে সুপারসনিক স্পীডে তালিম দিয়ে তেরাত্তির যেতে না যেতে দুশমনী মার্কিনী কায়দায়, বহু বৎসরের হারিয়ে যাওয়া ফিরে পাওয়া ভাইটির মত সদর দাউদকে নিয়ে পাঠানী বেরাদরী কায়দায় একই বর্তন থেকে গোশ্‌ত্‌-রুটি খেতে আরম্ভ করে দিল? আমি মূর্খ, বার বার আহাম্মুক বনে বনে ঐ তামাশায় দস্তুরমত চ্যাম্পিয়ন, আম্মো বেবাক অবাক। ক্ষণতরে ভাবলুম, "পূর্বদেশ" বিজ্ঞাপিত ধারাবাহিকের ধারাটা বেলাবেলিই পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দি। পরে দেখলুম কিলটা হজম করে নেওয়াই প্রশস্ততর।

রুশের এই সৃষ্টিছাড়া আচরণের কারণটা কি?

অবশ্যই প্রথম কারণ, শত বৎসরের পুরনো ইংরেজ সপত্ন বঁধুয়ার আঙ্গিনাতে আজ আর নেই। সে থাকলে এই বরমাল্য দানের বদলাই নেবার তরে এনে দিত মোতির মালা। রুশকে আনতে হত লাল-ই-বদখশান—চুনী। ইংরেজ আনতো…গয়রহ ইত্যাদি।

অর্থাৎ দাউদ যাত্রারম্ভের পূর্বেই হয়তো বা রুশের আশীর্বাদ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হয়তো বা, রাজা জহিরের নিরপেক্ষ নীতি রুশ পছন্দ করতো না। দাউদ হয়তো ভিন্ন ওয়াদা দিয়েছেন। জহিরের নীতি একদিন হয়তো

মার্কিনকে ইংরেজের ভ্যাকুয়ামে টেনে আনত। কান্দাহার জলালাবাদকে ঘায়েল করার জন্য রুশ আজ সদর দাউদকে যা দেবে, মার্কিন তার বদলে দাউদ বৈরীদের দিত মোতির মালা, রুশকে ছুটতে হত বদখশান···উপরে দেওয়া আড়াআড়ির "বাজার দর" দ্রষ্টব্য। অতএব মার্কিন নাগর রসবতীর সন্ধানে আসার পূর্বেই দাও স্বীকৃতি।

কয়েক বছর আগেও রুশ ঝটিতি দাউদকে এ রকম স্বীকৃতি দিত না, কারণ কিংবদন্তী অনুযায়ী যে হিন্দুকুশ পর্বত উত্তীর্ণ হবার সময় সে পর্বত বিস্তর হিন্দুর (আর্যের) প্রাণহরণ করে (কুশ্‌ৎ, তাই "হিন্দুকুশ"), সেটাকে অতিক্রম করে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও ট্যাঙ্ক-কামান কাবুলে আনাটা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেশ কয়েক বছর হল বাদশা জহিরের অনুরোধে রাশানরা অপথে বিপথে কয়েকটা টানেল খুঁড়ে, লেভেল রাস্তা বানিয়ে, কে জানে ক'হাজার ফুট চড়াই উৎরাই তো এড়িয়েছে বটেই, তদুপরি না জানি ক'শ'মাইল রাস্তাও কমিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় পক্ষ পাকিস্তান

তদুপরি সরাসরি দুশমন না হলেও পাকিস্তানের সঙ্গে রুশের ঠিক বনছে না। কারণটা অতীব সরল। পাকিস্তান নিক্‌সনের চতুর্দিকে সাত পাকের বদলে সত্তর পাক খাচ্ছেন। পাকিস্তানই অগ্রণী হয়ে মার্কিনের সঙ্গে তার দুশমন চীনের ভাবসাব করিয়ে দিয়েছে। এখন তার দাদ নিতে হবে। এবং এর সঙ্গে জড়িত আছে আরেকটি ফৌজী চাল। শেষ পর্যন্ত যদি চীনের সঙ্গে লেগে যায় তবে আফগানিস্থানের ঘাঁটি থেকেও চীনকে কিছুটা বিব্রত করা যাবে।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার মনে ধন্দ সৃষ্টি করেছে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, আমান উল্লাকে বিতাড়িত করার পিছনে ছিলেন, যাঁকে প্রায় আফগানিস্থানের পোপ বলা যেতে পারে, সেই শোর বাজারের হজরৎ। ডাকু বাচ্চা ই সাকোও কাবুলের দিকে এগিয়ে আসার পূর্বেই তাঁর আদেশে শাহী ফৌজের সেপাইরা বাগ-ই-বালা ত্যাগ করে যে যার বাড়ি চলে যায়। আমি পূর্বেই প্রশ্ন শুধিয়েছিলুম, আর্ক এবং বাগ-ই-বালা দাউদ খান দখল করলেন কি করে? যতদূর জানা গেছে, বলবার মত কোনোই প্রতিরোধ সেখানকার সৈন্যরা দেয় নি—হয়তো বা কু'র পূর্বেই এরা আপন আপন গাঁয়ে শোর

বাজারের বর্তমান-গদি-নশীনের আদেশে চলে গিয়েছিল। এবং এটাও লক্ষ্য করেছি, সদর দাউদ সরকারী পদ্ধতিতে সাড়ম্বরে তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছেন, তাঁর নবীন রাষ্ট্র যদিও রিপাবলিক তবু সেটা "ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী" গঠিত হবে। বলা বাহুল্য সেটা সুন্নী মজহব অনুযায়ী। তদুপরি দাউদ খান যখন দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বোঝাপড়ার মত অনেক কিছু অনেক দিন থেকেই তাঁর রয়েছে তখন শোর বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে আনেন, স্বয়ং মরহুম জিন্না থেকে আরম্ভ করে কোন্ কোন্ পাক নায়ক শিয়া। এমন কি শিয়া না হয়েও জফরউল্লা এঁদের আরেক ধাপ নিচে—তিনি কাদিয়ানী। গোঁড়া আফগান সদাসর্বদা কাদিয়ানী মাত্রকেই ইসলাম-ত্যাগী মুলহিদ বলে গণ্য করে এবং তারা ওয়াজিব উল-কৎল্ -যাদের কতল করা ওয়াজিব। কাবুলবাসী জাত হিন্দু বা শিখের কাছ থেকে হয় তো বা জিজিয়া তোলা যায়, কিন্তু তাদের উপর অত্যাচার করার বিধান নেই। স্বয়ং আমান উল্লার আমলে শহর-কাজীর হুকুমে একজন তথাকথিত কাদিয়ানীকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হয়। দাউদেরও শিয়াদের প্রতি নিজস্ব উৎকট জাতক্রোধ আছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ইরানের শিয়া শাহের প্ররোচনায় জহির তাঁকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্ত করে, সর্দারদের হিসেবে না নিয়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাদামাটা ডঃ ইউসুফকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেন।[১]

শোর বাজার-যাজক-সম্প্রদায় আমান উল্লা বিরোধী ছিলেন বলে "ধর্ম বিদ্বেষী" সোভিয়েৎ আমান উল্লাকে যতখানি পারে সাহায্য করে—সেটা অবশ্য যৎসামান্য। কিন্তু তখন সোভিয়েৎ রাষ্ট্র মাত্র এগারো বৎসরের বালক। কম্যুনিস্ট বৈরীরা বলে, সোভিয়েৎ ইতিমধ্যে ধর্মবাদে যথেষ্ট সহিষ্ণু হয়ে গিয়েছে, এমন কি প্রয়োজন হলে যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঁতাঁৎ করতেও এখন তার বিশেষ কোনো বাধা নেই। ইতালীর শান্ত সংযত কম্যুনিস্ট নেতা নাকি এ পথ সুগম করে দেন।

এ সব জল্পনা-কল্পনা যদি সত্য হয় তবে একটা অভিজ্ঞতা-জাত তত্ত্ব এ-স্থলে স্মরণে রাখা ভালো। কাবুল রাজদূতাবাসের একাধিক ইংরেজ কূটনৈতিক আমাকে বলেন, আফগান ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের মোটা রকমের মদৎ নিয়ে যিনিই এযাবত আফগান রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছেন, তিনিই

১। ডঃ ইউসুফ বুদ্ধিজীবী ও রবিভক্ত। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরের বৎসরই শান্তিনিকেতনে এসে কবির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

আজ হোক কাল হোক জনপ্রিয়তা হারান এবং তাঁকে হটাবার জন্য নূতন ষড়যন্ত্র নূতন বিপ্লববাদীর অভাব হয় না। একটা প্যাস্‌টাইম শেষ হতে না হতে অন্য দুর্দিবের কথা কল্পনা করতেও আমার মন বিকল হয়ে যায়। আমরা গরীব, আফগা'নস্থান আমাদের চেয়েও নিঃস্ব। সেখানে অযথা শক্তিক্ষয় রক্তপাত সার্বিক দৈন্য বৃদ্ধি করার জন্য গ্রহ কুগ্রহের যোগাযোগ।

ভারত একদা আফগানিস্থানের প্রতিবেশী ছিল, এখন নয়। সে স্বীকৃতি দিয়েছে একটিমাত্র বিষয় বিবেচনা করার পর। যে কোনো কারণেই হোক, তার বিশ্বাস হয়েছে সদর দাউদের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা সফল হবে। তদুপরি হয়তো বা কেউ কেউ বলবে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে যে বিলম্ব করেছিলে সেটার পুনরাবৃত্তি করো না। ব্যক্তিগতভাবে আমি অতি অবশ্য বাংলাদেশ ও আফগানিস্থানকে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একাসনে বসাই না, যদ্যপি আমি চিরকালই আফগানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। নীতির দিক দিয়ে, মানবতার দৃষ্টিবিন্দু থেকে বাংলাদেশের দাবী বহু বহু উচ্চে।

মিঃ ভুট্টো পড়েছেন ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। ওদিকে মুর্শিদ নিকসনও "অসুস্থতা" ও ওয়াটার-গেট দুই গেরোর চাপে পড়ে সদর ভুট্টোর ভেট নামঞ্জুর করেছেন, এদিকে পাকদ্বেষী শিয়াবৈরী সদর দাউদ বড্ড বেশী মাত্রায় ভেট করতে চাইছেন যে।

রাজনীতি অবিশ্বাসে

ভারতের এক প্রাচীন রাজা তাঁর দেশের সর্বোত্তম চিকিৎসক, কামশাস্ত্রবিদ এবং রাজনীতিজ্ঞকে ডেকে বললেন, "তোমরা সবাই যে যার শাস্ত্রে পর্বতপ্রমাণ কেতাব-পুঁথির যে সব কাঞ্চনজঙ্ঘা নির্মাণ করেছ সেগুলোতে আরোহণ করার প্রবৃত্তি এবং শক্তি আমার নেই। তোমরা তিনজন মিলে মাত্র একটা শ্লোকে আপন আপন বিদ্যে পুরে দাও। ঐ দিয়েই আমার কাজ চলে যাবে।" এস্থলে অক্ষম লেখকের সসঙ্কোচে নিবেদন, আসলে রাজা চার শাস্ত্রের চার সুপণ্ডিতকে ডেকেছিলেন, আমি চতুর্থ পণ্ডিতের বিষয়বস্তু তথা শ্লোকের চতুর্থাংশ বেমালুম ভুলে গিয়েছি। অতএব আশুতোষ ও অল্পতোষ পাঠককে বক্ষমাণ ত্রিলেগেড-রেস দেখেই সন্তুষ্ট হতে হবে।

বৈদ্যরাজ তাঁর বরাদ্দ শ্লোকাংশে লিখলেন: 'জীর্ণে ভোজনং।' অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা খেয়েছ সেটা হজম—'জীর্ণ'—হলে পর তবে 'ভোজনং' অর্থাৎ তখন

খাবে। এই বিসমিল্লাতেই ডাক্তার এবং কবিরাজে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডাক্তারের আদেশ, রুটিনমাফিক, পানকচুয়ালি, প্রতিদিন একই সময়ে ভোজনং! পক্ষান্তরে কবিরাজ বলছেন, পূর্বাহ্নের পূর্বান্ন হজম হলে পর আপনার থেকেই ক্ষুধা পাবে, তখন খাবে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনের উল্টো বিধান। যেদিন শারীরিক পরিশ্রমের বাড়াবাড়ি সেদিন ক্ষিদে পায় তড়িঘড়ি। যেদিন কারফ্যুর কানমলায় উঠান-সমুদ্র পেরোনো প্রাণের দায়, সেদিন ক্ষিদে আদপেই পায় কি না পায়! অতএব পানকচুয়ালি ভোজন হয় কি প্রকারে? তদুপরি অদ্যদিনের সুপার-ডাক্তার রোগ ধরতে না পারলেই বলেন, নার্ভাস—একদা যেমন বলতেন এলার্জি। তা তাঁরা যা বলুন, যা কন—পাড়ার বারিক মালিক অবধি সব্বাই জানে, হৃদয়মন বিকল থাকলে ক্ষিদে পেট ছেড়ে মাথায় চড়েন।

মমেকসদয় পাঠক ঈষৎ অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, কোথায় কাবুলের হানাহানি আর কোথায় তুমি করছো ডাক্তারবদ্যি নিয়ে টানাটানি!

কনফেশন বা কৈফিয়ৎ

পয়লা কদম ফেলার নাম মকদ্দমা, এর হুবহু সংস্কৃত প্রতিশব্দ অবতরণিকা। মকদ্দমা বলতে আরবীতে মামলা দায়েরের পয়লা পর্ব—প্রিমা ফাশি কেস—বোঝায়। বাংলায় সাকুল্যে মোকদ্দমাটা বোঝায় এবং তারও বেশী আগা-পাশ-তলা মোকদ্দমা এবং তার সাথী আর পাঁচটা বিড়ম্বনা বোঝাতে হলে বলি, মামলা-মোকদ্দমা। 'ইতিহাসের দর্শন' শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা ইব্‌ন খলদুন তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের অবতরণিকা 'মুকদ্দমার' জন্য বিশ্ববিখ্যাত।

আসলে যা বলার কথা সেটি মোকদ্দমাতেই বলে নিতে হয়। আমারও "শাদীর পয়লা রাতেই বেরাল মারা" উচিত ছিল, অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ধারাবাহিকের পয়লা কিস্তিতেই। কিন্তু সে সময় ভাই-বেরাদর পাড়ার পাঁচো ইয়ার চোঁক চোঁক করছেন সদ্য সদ্য তাজা কাবুলী মেওয়া চাখবার তরে। আমার ফরিয়াদ শুনবে কে?

বাংলাদেশের পাঠক আমাকে চেনেন অল্পই। এর ভিতরে অনেকেই আবার আমার উপর রাগত ভাব পোষণ করেন। মরহুম "পূর্ব পাকিস্তানের" সেকেণ্ডারি বোর্ড আমার সর্বনাশকল্পে মল্লিখিত প্রথম পুস্তক থেকে তাঁদের স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থে বেপরোয়া ঝালে-ঝোলে-অম্বলে অর্থাৎ ক্লাস সিক্‌স্ থেকে ম্যাট্রিক

অবধি দু'পাঁচ পাতা তুলে দিতেন। আর কে না জানে, এস্কুয়েলের আজরাইল না আসা পর্যন্ত—রবি-কবির ভাষায়, "অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা"—কোন্ মূর্খ পাঠ্য পুস্তককে পাঠের উপযোগী বলে মনে করে? বললে পেত্যয় যাবেন, "কাবুলীওয়ালার" মত সরেস সরস গল্প ক্লাসে পড়াতে গিয়ে আমি হিমসিম খেয়েছি? বরঞ্চ বাচ্চাটাকে জোর করে কুইনিন গেলানো যায়, কিন্তু জোর করে রসগোল্লা গেলাতে গেলে সে যা লড়াই দেয় তার সামনে মুক্তি-যোদ্ধাও ভাবে মিঞা ওসমানীর জায়গায় একে জঙ্গীলাট বানালে ন'মাস আগেই স্বরাজ আসতো।

আমার লেখা ভালো না মন্দ তার সাফাই আমি গাইব কি? মোদ্দা কথা—আমার রচনা পাঠ্যপুস্তকে তুলে সেটা জোর করে জোরসে যাদের গেলানো হয়েছে তাদের বর্তমান আবাস ঢাকার ভিন্ন ভিন্ন হল্-এ। সাধে কি আমি ওসব পাড়া এড়িয়ে চলি!

সূর্যসেন হল, বাপস! নব পরিচয়

তাই আমি নূতন করে আমার পরিচয় দিতে চাই। প্রায় বিশ বৎসর ধরে আমার লেখা এ দেশে পাওয়া যেত কালে কস্মিনে। ওপার বাংলা আমায় কিছুটা চিনেছে ঐ দুই দশক ধরে। "পূর্বদেশের" বিজ্ঞপ্তি যে, আমি সনাতন "আফগানিস্তান আজকের দৃশ্যপটে" ফেলে 'ধারাবাহিকভাবে' লিখব, এ খবরটা যদি পাক-চক্রে সেখানে পৌঁছয় তবে ঘটিরা যে কী অট্টহাস্য ছাড়বে সে আপনারা হাইকোর্ট দর্শনে না গিয়ে স্রেফ বুড়ীগঙ্গার পারে বসেই ঘটিগঙ্গার জলমর্মরের সঙ্গে শুনতে পাবেন। ওরা এবং এ-পারে, বহু দূরের বগুড়াবাসীরা মাত্র গুহ্য তত্ত্বটি অবগত আছেন; পার্টিশেনের পরেই একটি বিশেষ দ্রব্য হেথাকার নওগাঁ থেকে চালান বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ছেলে সরাসরি নওগাঁ যাই কি প্রকারে? তাই সেটাকে বগুড়াবাসের কামুফ্লাজে ঢেকে সেখানে কয়েক মাস কাটাই। কিন্তু কপাল মন্দ। চীফ-সেক্রেটারী আজিজ আহমদ—আহা, কি 'আজিজ' প্যারা দোস্তই না পেয়েছিল মহাপুণ্যবান মরহুম পূর্ব পাকিস্তান—তিনি আমাকে হাতের কাছে না পেয়ে লাগলেন আমার ইষ্টিকুটুমের পিছনে। কিই বা করি তখন আমি আর! গুটি গুটি ফের কলকাতা। মেহেরবান আজিমুশ্শান আজিজ আহমদ খান জান-প্রাণ ভরে তসল্লীর ঠাণ্ডী সাঁস ফেললেন! পাকের চেয়ে পাক মশরিকী পাকিস্তানকে

বরবাদ পয়মাল করার তরে যে বদ-বখৎ হিন্দুস্থানী এসেছিল হেথায়, সে-ইবলিস গেছে! "জিন্দাবাদ সাহেবজাদ আজিজ" যদিও তিনিই পুব পাক বাবদে যে পাক-সে-পাক সব-সে পহলী পালিসির (পলিসির খাঁটি আজিজী পাঞ্জাবী উচ্চারণ) পালিশ লাগিয়েছিলেন, তারই ফলে ভজন দুই বছর যেতে না যেতেই উপরকার দুই পাকের "ভাই বেরাদরী" ভণ্ডামির পলকা পলস্তরা উবে গিয়ে বেরিয়ে এল—গিল্টি, গিল্টি, নির্ভেজাল গিল্টি; আজিজের দুই চোখ, দিলজানের দুশমন রবিঠাকুরের কণ্ঠে তখন পাগলা মেহের আলীর চীৎকার "তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।"

ব্‌ এক্ গর্দিশে চর্‌খ-ই-নীলুফরী
ন্‌ আজিজ বজ্‌-আমদ ন্‌ নাদরী ॥

("সুনীল নীলাম্বুজের ন্যায় গভীর নীলাকাশ একটি বারের মত পরিবর্তিত হইয়াছে কি, না—নাদির এমন কি তাহার নাদরী হুকুম পর্যন্ত লোপ পাইল"—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ। আমি শুধু প্রথম "নাদিরের" স্থলে আজিজ লোকটাকে দিয়ে নাম পরিবর্তন করেছি; স্বাধিকারপ্রমত্ত আজিজ "চোটা-ওয়ালা" নাদিরের মত ফরমান ঝাড়তেন বলে "নাদরী"র পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করি নি।)

মেহেরবান সম্পাদক, অকারণ অকৃপণ অভাজন-অনুরক্ত পাঠক, আজ যদি প্রাণ খুলে দু'টি মনের কথা কই তবে অপরাধ নিয়ো নি। সিকি শতাব্দী ধরে ট্যাঁ-ফুঁ-টি করার উপায় ছিল না। ওপার বাংলাতেও না। এপারে যে আমার শতাধিক প্রিয়ের চেয়ে প্রিয়তর জন রয়েছে।

আচ্ছা, সে নয় আরেকদিন হবে।

গঞ্জিকা মিশ্রণ

নওগাঁয়ের সেই বিশেষ বস্তুটির সঙ্গে 'গুল' যোগ করে যে অনির্বচনীয় রস তৈরী হয় আমি তারই রাজা—গুলমৃগির। আলমৃগিরের ওজনে টায় টায়। এর পুরো ইতিহাস বারান্তরে।...নিতান্তই কপালের গেরো, গ্রহের গর্দিশে আমি দু'পাঁচজন গুণীর সংস্রবে একাধিকবার আসি। তাদেরই ঝড়তি পড়তি মাল নিজের নামে চালিয়ে বাজারে কিঞ্চিৎ পসার হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত অবিমিশ্র সত্যঃ—গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা তথ্য ভেজাল না দিয়ে পরিবেশন করাটা আমার ধাতে সয় না, স্যাকরা যেমন আপন মায়ের জন্যে গয়না গড়ার সময়ও

সোনাতে খাদ মেশাবেই মেশাবে। আমি উভয় বাংলার ক্লাউন ভাঁড়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সার্কাসের ক্লাউন হরেক বাজীকর, প্রত্যেক ওস্তাদের কিছু-না-কিছু নকল করতে পারে। আম্মো পারি।

অতএব প্রকৃত চাণক্য, আজকের দিনের রাজনৈতিক ভাষ্যকার আলাস্টের কুক-এর অনুকরণে আমি অতি যৎসামান্য কিছু বলতে গেলেও তার সঙ্গে গাঁজা-গুল মিশে যায়। আমি মূল বক্তব্যে নিজকে কিছুতেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারি নে। কবিত্ব রস রক্তে থাকলে বলতুম, নাক বরাবর মোকামের দিকে হনহন করে না এগিয়ে মোকা বেমোকায় আকছারই পথের দু'পাশে নেমে ফুল কুড়োই, প্রজাপতি-স্পন্দন ভ্রমর গুঞ্জনে বার বার মুগ্ধ হয়ে হঠাৎ দেখি, তপ্তদিনের শেষে মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—এবং মন্‌জিলে মা দূর আস্ত্‌। পথের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, এ তাবৎ বাঘ সিঙ্গির পেটের ভিতর যাই নি। সেই কুড়োনো ফুলের দু'চারটে পাঠকের সামনে অবরে সবরে পেশ না করতে পারলে আমার মেজাজ খাট্টা হয়ে যায়।

কামশাস্ত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত লিখলেন, "তন্বী সকাশে মৃদ্বাচারী" অর্থাৎ তন্বী-শ্যামা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী তথা সর্ব নারীজনকে মৃদু-আচারে জয় করবে। জর্মন দার্শনিক বলেছেন, "নারী সকাশে গমনকালে বেত্রদণ্ডটি নিয়ে যেতে ভুলো না—ফেরগিস ডি পাইট্‌শে নিষ্ট্‌"; প্রাগুক্ত কাম-পণ্ডিতের একদম বিরুদ্ধ বাণী, নিরুদ্ধ উপদেশ। আমার কোনো মন্তব্য নেই। আমি হাড়-আল্‌সে জড়ভড়ত। তাই বেকার বখেড়া না বাড়িয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।

রাজনীতিবিদ পণ্ডিত দু'টি শব্দেই মোক্ষমতম তত্ত্ব "রাজনীতিতে অবিশ্বাস" প্রকাশ করলেন। অর্থাৎ রাজনীতির আগাপাস্তলা অবিশ্বাসে গড়া।

রাজনীতিতে অবিশ্বাস নয়, অবিশ্বাসে রাজনীতি।

আমান বনাম নাদির

আমান উল্লা অবিশ্বাস দিয়ে কর্মারম্ভ করে থাকলেও আখেরে নীতি ভ্রষ্ট হয়ে রাজ্য খোয়ালেন।

নাদির শাহকে নির্বাসনে পাঠালেন। কিন্তু সসম্মানে। অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজদূত রূপে। দারাপুত্রকে জামিনস্বরূপ কাবুলে আটকে রেখেছিলেন কি না, সেটা গুরুত্বব্যাঞ্জক। আমি কাবুলে রাজগোষ্ঠীর অনেক বালক-কিশোরকে চিনতুম। বেশ ক'জন আমার ছাত্র ছিল। কিন্তু জহির খানের কথা একবারও

শুনি নি। হয়তো বা কয়েক বৎসর পর নাদির যখন রাজদূত-কর্মে ইস্তফা দিয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন তখন স্বভাবজাত কোমল-হৃদয় আমান উল্লা নাদিরের দারাপুত্রকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, কিংবা হয়তো গোড়ার থেকেই আটক রাখেন নি।

একটা কথা এখানে ভালো করে মনে গেঁথে নিতে হয়। নাদির ফ্রান্সে পৌঁছেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধজয়ী মার্শাল পেঁতা এবং স্যাঁ সির-এর ফরাসী অফিসারদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন এবং আমি লোকমুখে শুনেছি, নাদির পেতাঁতে দিনের পর দিন বিরাট বিরাট মিলিটারী ম্যাপ খুলে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়নে নিমগ্ন হতেন। একদিন আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারাবেন আর তিনি স্বদেশ জয় করার জন্য লড়াই লড়বেন, এহেন আকাশ-কুসুম তিনি তখন চয়ন করেছিলেন কি না, সে তথ্য নির্ধারণ করবে কে? প্রবাদ বাক্য আছে, "ভাগ্যলক্ষ্মী" কোনো না কোনো সময়ে হাতে একটা সুযোগ নিয়ে প্রতি মানুষের দোরে এসে আগল ধরে নাড়া দেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেন, তাঁর কৃপাধন্য জন সে সুযোগের জন্য নিজকে প্রস্তুত করে রাখে নি। নাদির অতি অবশ্যই ব্যত্যয়।......একদিন ফ্রান্সে খবর পৌঁছল আমান উল্লা তখ্‌ৎ হারিয়ে দেশ-ত্যাগী হয়েছেন। নাদির তদ্দণ্ডেই স্বদেশমুখী হলেন। কিন্তু তিনি অর্থ-দীন, অস্ত্রহীন। কি করে তিনি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন সে ইতিহাস দীর্ঘ। ভারতে তখন আমান উল্লার প্রতি মাত্রাধিক সহানুভূতি। নাদির কিন্তু আমান উল্লার পক্ষে না বিপক্ষে সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। তিনি বললেন, "প্রথম কর্তব্য, ডাকু বাচ্চা ই-সকাওকে খেদানো; তখন দেখা যাবে।" তারপর "আফগান জনসাধারণ" তাঁকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালে তিনি স্বীকৃত হলেন। অবশ্য এ কথা সত্য, তখন তখ্‌তের জন্য অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা; যদিও এস্থলে অবান্তর, তবু বহুজন-হিতায় বলে রাখা ভালো, উপস্থিত তিনি তদ্বীরভোগ্যা।

প্রেসিডেন্ট দাউদ খান কিভাবে "নির্বাচিত" হয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিন্তু তাজ্জব মানতে হয়, অবিশ্বাস-শাস্ত্রে অবিশ্বাসী হলেও জহির শা'র নিরেট অতি-বিশ্বাসের আহাম্মুকী দেখে। তিনি কি আদৌ জানতেন না, দাউদ খান কতখানি শক্তিশালী? সেটা তো পরিষ্কার বোঝা গেল একটি মাত্র সাদামাটা তথ্য থেকে: ইহ সংসারে আর কোন্ কু দে'তার নায়ক চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কিংবা অল্লাধিককালের মধ্যে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করার পর ঢাউশ ধামা নিয়ে বসতে পেরেছেন স্বীকৃতি লাভের কামতরুতলে। পটাপট পড়তে লাগলো

তুনিয়ার গোটা গোটা মোটা মোটা সরেস সব মেওয়া—কাবুলী মেওয়াকে সঙ্গ দেবার তরে, একটা হপ্তা ঘুরতে না ঘুরতে! এস্তেক অভিমানভরে, গোসসা করে কমনওয়েলথ বীবীকে তিন-তালাক দেনেওয়ালা হী-ম্যান, হজরত আলীর তরবারি নামধারী অপিচ বাংলাদেশকে-মেনে-নিতে-নিতান্তই-লজ্জাবতী নখ্‌রা-রাণী সদর-ই-আলা আগা-ই-আগা মুহম্মদ জুলফিকার আলী ভুট্টো।

সু-উচ্চ স্বীকৃতিতরু শাখা থেকে তাঁর বাং-মাছ-পারা মোচড়-খাওয়া পতন-ভঙ্গির রঙ্গটা দেখতে আমার বড়ই সাধ যায়।

অবিশ্বাসস্য পুত্রা

মিস্টার ভুট্টোর অত্যধিক ভয় পাবার এখনো কোনো কারণ নেই। রুশ, মার্কিন, চীন, ইরান সবাই যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকে এবং মল্লভূমিতে সুদ্দুমাত্র সদর দাউদ পাকিস্তানের সদর ভুট্টোর মোকাবিলা করেন তবে ভুট্টোর বিশেষ কোনো তুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি কোনো স্টাটিসটিক্‌সের উপর নির্ভর করে এই ভাগ্যফল গণনা করি নি। ধরে নিলুম, তুই মল্লবীর লড়াই লাগার পর তাঁদের আপন আপন দেশে যা অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যবল আছে তাই নিয়ে লড়ে যাবেন। কোনো পক্ষই বিদেশী কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি কিংবা ডাড বুলেটও পাবেন না। জানি, আজকের দিনে এ রকম একটা ভ্যাকুয়ামে তুই পক্ষ বেশী দিন লড়তে পারবেন না। মার্কিন, রুশ, চীন—তিন রাষ্ট্রই যে বিশ্বের একচ্ছত্রাধিপত্য চান এ রকম একটা সিদ্ধান্ত কেউই কসম খেয়ে করতে পারবেন না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ তত্ত্বটা স্বীকার করে নিতেই হবে যে, এই তিন জনের প্রত্যেককেই প্রতিদিন ঘামের ফোঁটায় একে অন্যের কুমির দেখেন। মাঝরাতে হঠাৎ রাশা তুঃস্বপ্ন দেখে জেগে বসে ককিয়ে ওঠে, "ঐয্‌-যা! মার্কিন ব্যাটারা বুঝি কাম্বোজ গিলে ফেললে! হুঁ, কাল আবার রিপোর্ট পেয়েছি, মার্কিন মুর্গীটা এক ঝটকায় আরও এক ডজন এটম বম পেড়েছে। একুনে তা'হলে কত হল? আমার ভাঁড়ারে ক'টা?" মার্কিন ঐ একই তুঃস্বপ্ন দেখে, "বলশি ব্যাটারা যে বড্ড বেশী গুড়ি গুড়ি জাপানের সঙ্গে দোস্তী করার তরে এগোচ্ছে। আর মাটির তলায়, কিংবা ঐ বহুদূর আর্কটিকের সমুদ্রগর্ভে যদি এটম বম ফাটায় তবে হেথায় কি সেটা যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়বে? হুঁ, সত্যি বটে বাবাজী ব্রেজনেফ এসেছিলেন বোষ্টমের নামাবলী পরে, বাজালেন শ্রীখোল, কিন্তু, দাদা কিসিংজার, ভুলে যেয়ো না, মাইরি, শ্রীযুত

মলটফও বৈষ্ণবতর চন্দনের এ্যাব্বড়া তিলক কপালে এঁকে ঘোরতর-শক্তি শ্রীহিটলারের সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এসেছিলেন শ্রীবৃন্দাবন—বার্লিন কুঞ্জে। ফলং? সর্বশেষ ফল হিটলার গোটা মুল্লুকসুদ্ধু গেলেন টেঁশে!" চীন কি স্বপ্ন দেখে তার ছোট্ট একটি নমুনা বলে গেছেন সাধনোচিতধামপ্রাপ্ত জওয়াহির লাল। চীন নেতা নাকি তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, "লড়াইয়ের নামে শিউরে উঠবে তোমরা, এরা-ওরা, আর-সব্বাই—সে তো বাংলা কথা! কিন্তু আমি ডরবো কোন্ দুঃখে! দু'পাঁচ কোটি মরে গিয়ে তোমরা সবাই যখন চিৎপটাং, তখনো আমার আরো ক'কোটি রেস্ত থাকবে, হিসেব করে দেখেছো? দুনিয়াটা দখল করতে তখন আমাদের গাদা-বন্দুকটারও দরকার হবে না।" জাপানও যে কোনো স্বপ্নই দেখছে না, কে বলবে? কুল্লে দুনিয়ার "ত্রাহি ত্রাহি" চিৎকার বেপরোয়া ডোণ্টো-কেয়ার করে ঐ যে হোথা ফ্রান্স পরশুদিন এটম বম ফাটালে, সেটা কি খয়রাতি হাসপাতাল খোলার হুলু-ধ্বনি?...অবিশ্বাস অবিশ্বাস, সর্ব বিশ্বে অবিশ্বাস! "শৃন্বন্তু বিশ্বে অবিশ্বাসস্য পুত্রা—"

অসকার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, "আমাদের প্রত্যেকেরই বেশ কিছু বেকার বাজে জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু ভয়, পাছে কেউ কুড়িয়ে নেয়!" আফগান দেশে মাইলের পর মাইল শুধু পাথর আর পাথর, কিংবা সিন্ধু দেশে বালি আর বালি; কিন্তু হলে কি হবে, আমি—মার্কিন যদি দখল না করি তবে বলশি ব্যাটা যে নেবে না, তারই বা কি পেত্যয়? ইণ্ডিয়াই বা কোন তক্কে তক্কে আছে কে জানে? এই হল বিশ্ব ভুবনের শঙ্কা, বিভীষিকা!

অতএব এটা নিতান্তই কল্পনা-বিলাস যে, দাউদ খান আর ভুট্টোর ব্যারিস্টারে রোঁদের পর রোঁদ লড়ে যাবেন আর দুনিয়ার কুল্লে নেশন রাস্তার ছোঁড়াদের মত শুধু হাততালি দিয়েই মজাটা লুটে নেবেন। কথাটা খুবই খাঁটি কিন্তু এই কল্পনা-বিলাসেও সুদ্দুমাত্র যে আকাশ-কুসুম চয়ন করা হয়, তা' নয়। বিজ্ঞানীরা বিস্তর এক্স্পেরিমেণ্টে প্রথম ভ্যাকুয়ামে সফল হলে পরে স্বাভাবিক বাতাবরণের প্রভাবদুষ্ট অবস্থায় অর্থাৎ রুশ-মার্কিন-ইণ্ডিয়া-ইরানের আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির মৎলবের মাঝখানে—সেই এক্স্পেরিমেণ্টের পুনরাবৃত্তি করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করেন।

যদিস্যাৎ

ভ্যাকুয়ামের লড়াইয়ে ব্যারিস্টারের বিশেষ ভয় পাবার কিছু নেই।

ধরে নিলুম, দাউদ খান প্রধানতঃ রুশ বা/এবং যে-কোনো জাতের কাছ থেকেই হোক অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু জমায়েৎ অবস্থায় পেয়েছেন তথা জহির শাহ চল্লিশ বছর ধরে যা-সব কিনেছিলেন তাই নিয়ে নামলেন লড়াইয়ে। মোল্লাদের হুকুমে সেপাই পেতেও অসুবিধে হবে না। আর সরাসরি হুকুমটাও গৌণ,—শোর-বাজার বারণ না করলেই হল। আসল যে যুক্তি শাহী ফৌজকে অনুপ্রাণিত উদ্বুদ্ধ করবে, তার দিল্ জানে জোশ পয়দা করবে সেটা অতি অবশ্যই—লুট করার সম্ভাবনা কতখানি? আফগান সরকার সেপাইদের যে কি মাইনে দেন সে আমার জানা আছে। পূর্বেই ধরে নিয়েছি অন্য কোনো রাষ্ট্র সদর্ দাউদকে কোনো অর্থ সাহায্য উপস্থিত করবে না। আর করলেও যা হবে সেটা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করতে পারি। ইনফ্লেশন। আঁৎকে উঠলে নাকি, সোনার বাংলার পাঠক? সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেলে নাকি? কিন্তু পাঠান এই সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি চেনে না।

ইনফ্লেশন

ঈষৎ অবান্তর হলেও, পাঠক, তুমি উপকৃত হবে। বিশেষ উপস্থিত আমরা যখন কাবুল-পেশাওয়ার নিয়ে আলোচনা করছি। আমার জানা মতে যে মহাপুরুষ এ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম ইনফ্লেশন নামক গজব্‌টা অনুমান করতে পেরেছিলেন তিনি বাবুর বাদশা। হিন্দুস্থান জয় করার পর বাবুর বাদশার আমিররা কাবুলে ফিরে গিয়ে লুট-তরাজে বিস্তর যে-সব ধন-দৌলত জমা করেছিলেন সেগুলো দু'হাতে ওড়াবার জন্য বাবুরের কাছ থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি বিস্তর যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হিন্দুস্থানের মত ঐশ্বর্যশালী বিরাট রাজত্ব ত্যাগ করে কাবুল-কান্দাহারের মত নির্ধন দেশে ফিরে যাওয়াটার মত আহাম্মুকী তাঁর কল্পনাতীত। আমিররা পণ ছাড়েন না। শেষটায় তিনি যা বললেন (আমি স্মৃতি থেকে বলছি, পাঠক "বাবুর-নামাতে" পাবেন) তার বিগলিতার্থ: 'ধরুন, এখন কাবুল-বাজারে দৈনিক ওঠে এক হাজার আণ্ডা। আপনারা বিস্তর টাকা-কড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তো সেখানে তিন হাজার আণ্ডা হাজির হবে না। কাবুল এবং

তার আশেপাশের উৎপাদন শক্তি তো আর রাতারাতি বেড়ে যেতে পারে না। আপনারা একে অন্যের সঙ্গে লড়ালড়ি করার ফলে আণ্ডার দাম তখন যাবে চ'ড়ে। যে আণ্ডা আগে এক পয়সা দিয়ে কিনতেন সেটা কিনবেন এক-টাকা দিয়ে, যে গালিচা কিনতেন একশ' টাকা দিয়ে সেটা কিনবেন এক হাজার টাকা দিয়ে। লাভটা তা হলে কি হল? আগে যে-রকম আমোদ-আহ্লাদ করতেন এখনও করবেন ততখানিই। মাঝখানে শুধু কাঁড়িকাঁড়ি মোহর দিনার ঢালাই হবে সার।'

অবশ্যই আমিররা এই সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক তত্ত্বটির কানাকড়িও বুঝতে পারেন নি। তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত বাবুর বাদশাহকে বর্জন করে কাবুল চলে যান নি তার অন্য কারণ ছিল। কিন্তু আমিরদের দোষ দিলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। দুষ্টলোকে বলে বাংলাদেশে এখন ইনফ্লেশন। কেনবার জিনিস নেই, ওদিকে নোটের ছয়লাপ, ইনফ্লেশন হবে না তো কি, আসমান থেকে মন্না সলতা ঝরব? আমি নিজে জানি নে। মার্কিন মুল্লুকে তো কোন দ্রব্যের অভাব নেই তবে ডলার মার্কেটের ধাক্কায় বিশ্বজোড়া ধুন্দুমার লেগে গেছে কেন? একাধিক গুণী বলছেন, নিক্সন কর্ণধার হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন, অবশ্য আমাদের তুলনায় ধূলি পরিমাণ এবং অর্থশাস্ত্রের প্রাচীন অর্বাচীন ভাণ্ডর ব্যাঙ্কার প্রফেসার বাণিজ্যের কর্ণধার সব্বাই বলেছেন, এ-ইনফ্লেশনের কারণ এবং দাওয়াই যে মুনি বাৎলাতে পারবেন তিনি অর্থশাস্ত্রের ইতিহাসে অজরামর হয়ে বিরাজ করবেন।

দুশমন বাইরে না ভিতরে

মোদ্দা কথায় ফিরে আসি।

কবে সেই ১৯৫৩ থেকে দাউদ খান দাবী জানাচ্ছেন, ফ্রনটিয়ার এলাকাকে স্বায়ত্তশাসন দাও, আর (হিটলারি কায়দায়) আমাকে দাও খাইবার পাস পেরিয়ে করাচী অবধি একটা করিডর। আমাদের একটা বন্দর না হলে চলবে কেন? পাঞ্জাবীরা বুদ্দু। তারা তখন চাইলে না কেন, খাইবার গিরিপথের পশ্চিম মুখ থেকে কাবুল অবধি একটা করিডর? কাবুলের গাছ-পাকা আঙুর, আপেল নাসপাতি, জরদ-আলু আলু বালু, শফৎ-আলু, গেলাস, চিলগুজা, বাদাম, আখরোট আপন হাতে পেড়ে পেড়ে না খেলে তাদের গায় গত্তি লাগবে কি করে? স্বাস্থ্য বরবাদ হয়ে যাবে না? ইয়ার্কি পেয়েছ?

দাউদ পাকিস্তানকে আক্রমণ করবেন সঠিক কোথায়? বেলুচিস্তানের চমন অঞ্চলে না খাইবার পাস অঞ্চলে—না উভয়তঃ? হিটলারের পয়লা নম্বরী ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি পর্যন্ত রাশার দীর্ঘ পত্র অতিক্রম করতে করতেই ঘায়েল হয়ে যেত। হঁ্যা, এখানে অত দূরের পাল্লা নয়। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলোও তেমন সরেস নয়। আর রাস্তার চওড়াই? না ওসব কোনো কাজের কথা নয়। বোমারু প্লেন? হঃ! ইয়েহিয়া পূর্ব পাক হারালো, তবু জাবড়ে ধরে রইল তার প্লেনগুলো।

ফ্রন্টিয়ার নো-মেনস-ল্যাণ্ডের পাঠানদের লেলিয়ে দেওয়া যায় না?

লুটতরাজ কোন অবস্থায়, কাকে করা যায়, কাকে করা যায় না, সেটা পুরুষানুক্রমে করে করে পাঠান এ বিষয়ে পৃথিবীর সেরা স্পেশালিস্ট। টিক্কা খান কিভাবে নিরীহ, নিতান্ত নিরস্ত্র বেলুচের উপর বেদরদ বে-এক্তিয়ার কায়দায় বোমা ঝরাতে পারেন সে তো তারা বেলুচিস্তানে পাহারা দেবার সময় সচক্ষে দেখেছে, এবং এই বাংলাদেশেও তারই মদদে তারা লুট করার সময় পাঞ্জাবীদের খুব-একটা পিছনে ছিল না। তার আখেরী নতীজা কি হয়েছে, সেটা ফ্রন্টিয়ারের পাঠানরা অবগত হয়েছে।

হিটলার বার বার তাঁর জেনারেলদের বলতেন, অত সতর্ক হয়ে পা টিপে টিপে রুশ দেশে অভিযান চালাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ রুশ দেশটা হুবহু একটা ঝুরঝুরে কুঁড়ে ঘরের মত, দরজাটার কাঠও পচাহাজা। মারো জোরসে বুট দিয়ে গোটা দুই লাথি। হুড়মুড়িয়ে বেবাক ঘর ধূলায় ধূলিসাৎ।

রাশার বেলা রোগ নির্ণয়ে হিটলার গোভলেট করেছিলেন।

ব্যারিস্টার ভুট্টোর পশ্চিম-পাক বাড়িটা দেখে সক্কলের মনে কিন্তু, কিন্তু-কিন্তু নাও হতে পারে।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়—টীকা

জন্মের দিনই মানুষের নামকরণ হয় না, কিন্তু প্রবন্ধ লেখার প্রারম্ভেই শিরনামা একটা না দিয়ে উপায় নেই। এ সুবাদে কবিগুরুর একাধিকবার-বলা বিশেষ একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ল। তদুপরি বাইশে শ্রাবণ আসন্ন। প্রাচীন দিনের কথা।...১৯২১ সাল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'ষাট বছরের যুবক'। পূর্ণোদ্যমে বিশ্বভারতীর সদ্যোজাত কলেজ বিভাগে ক্লাস নিতেন। নিজের কবিতা উপন্যাস এবং তাঁর প্রিয় ইংরেজ কবি শেলি কীটসের লিরিক। পাঠক হয়তো লক্ষ্য

করেছেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে কবিতাগুলোর কোনো শিরনামা নেই। তিনি নিজের থেকেই বললেন, 'কবিতার শিরনামা পড়ে পাঠক ধরে নেয়, গোটা কবিতাটা বুঝি ঐ নামটা সার্থক করার জন্যই লেখা হয়েছে। তা তো নয়। কবিতা যখন উৎস থেকে বেরিয়ে যাত্রাপথে নামে তখন আপন গতিবেগে চলার সময় শিরোনামার প্রতি দৃষ্টি রেখে সোজা পথে এগিয়ে যায় না। সে ডাইনে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে নিয়ে তার নতুন নতুন রূপ দেখায়। (এই ভাবাংশটুকু কবি গানে বলেছেন, "নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে/পাতার ভেলা ভাসাই নীরে")। মিস্‌রির সুতোটা থাকে চিনির টুকরোর ঠিক মাঝখানে। তাই বলে সুতোটাই সব চেয়ে বেশী প্রাধান্য তো ধরেই না, ঐ সুতোটার অস্তিত্ব সার্থক করার জন্য মিসরি আপন সত্তারও বিকাশ করে না। কবিতার বেলা তারও বেশী। কবিতা তার শিরনামার চতুর্দিকে ঘোরপাকও খায় না।'

বলা বাহুল্য, আমি জরাজীর্ণ ছলনাময়ী স্মৃতির উপর নির্ভর করেই কবির বক্তব্যের নির্যাস নিবেদন করলুম। খোজা সম্প্রদায়ের লোক "জামাৎ-খানায়" তাদের 'নামাজ' শেষ করার পর যে রকম বলেন, 'ভুলচুক, মৌলা, বখ্‌শো' আমিও উন্নাসিক পাঠকের কাছে নিবেদন জানাই, ভুলচুক যা হয়েছে বখশিশ-রূপে মাফ করে দিয়ো।

কিন্তু 'বলাকার' পরের কাব্য-গ্রন্থ "পলাতকায়" কবি পুনরায় শিরনামা দেবার প্রথায় ফিরে গেলেন। বোধ হয়, নামের পরিবর্তে কবিতাতে অঙ্ক-শাস্ত্র-সুলভ নম্বর লাগালে সেটা অপ্রিয় দর্শন তো হয়ই, তদুপরি এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, কোনো কোনো কবিতার শিরনামা আমার মত কবিত্বরসবঞ্চিত পাঠককে কবিতাটির মূল বক্তব্য বুঝে নিতে সাহায্য করে—অবশ্য তাবৎ কবিতাতেই যে মিসরির সুতোর মত একটা মূল সূত্র থাকবে এহেন ফৎওয়া কোনো আলঙ্কারিকই এ-তাবত কবিকুলের স্কন্ধে চাপাননি।

বক্ষ্যমান ধারাবাহিকের জন্মদিনেই একটা নাম, নিতান্তই দিতে হয় বলে প্রথম লেখার কপালে সেঁটে দিয়েছিলুম। আজ তার ষষ্ঠী—যাকে আমার দেশে "ছটি", উত্তরবঙ্গে বোধ হয় "ষাইটলা" না কি যেন বলে। এদিনে অন্তত নামটা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে হয়।

আসলে "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" বাক্যটি একটি ফরাসী প্রবাদ বাক্যের ভাবছায়া অনুবাদ। 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা ম্যাম শোজ"—"যতই সে নিজকে বদলায়, ততই তার মূলরূপ একই থাকে"—যতই তার 'পরিবর্তন' হয় না কেন, ততই ধরা পড়ে, 'সে অপরিবর্তনীয়'। এটাকেই অন্যভাবে বলা

হয়, "ইতিহাস নিজকে পুনরাবৃত্তি করে।" তার অর্থ যতই ভিন্ন দেশে ভিন্ন বেশে কোনো একটা ঘটনা ঘটুক না কেন, আখেরে ধরা পড়ে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ ঘটনাটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া নতুন নয়। তাই এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক দাদা আদমের আমল থেকে আজ পর্যন্ত এই বিরাট বসুন্ধরা খুঁজে বেড়ান 'প্যাটার্নের' সন্ধানে। যেমন কাশ্মিরী শালে আমের প্যাটার্ন পশমের উপর সোনার জরি দিয়ে করা, বানারসী কিংখাপে সেই প্যাটার্নই রেশমের উপর রূপোর জরি দিয়ে করা, রাজশাহীর আম-সন্দেশে সেই প্যাটার্নই শ্রেফ ছানা চিনি দিয়ে গড়া। মালমশলা যাই হোক, নির্মিত ও বস্তুটির চেহারাটি একই। খোল নলচে যতই পালটান—যেই হুঁকো সেই হুঁকো। কিংবা বলতে পারেন, একটা পশম আরেকটা রেশম—হরে দরে হাঁটু জল। কিংবা বলতে পারেন, পাড়ার মেধো ওপাড়ার মধুসূদন। কিংবা—না থাক্!

যাত্রারম্ভেই বলে রাখা কর্তব্য, আমি কট্টর মোল্লাকুলজাত পাতি মোল্লা। আমার পূর্ব-পুরুষ ছিলেন রাজহাঁস, আমি ভাগ্যবিপর্যয়ে পাতিহাঁস। প্যাটার্ন হরেদরে একই। আমার পক্ষে মোল্লাদের নিন্দাকীর্তন, যে-শাখায় বসে আছি তারই মূল কর্তন। আমি অত পাঁড় কালিদাস বা শেখ চিল্লী নই। তা সে যাই হোক, মূল কথা এই, আফগানিস্থানের ইতিহাস মোল্লা-মৌলবী ভিন্ন কল্পনা করা যায় না।

আমির হবীব উল্লা মোটের উপর সুখেই রাজত্ব করেছিলেন কিন্তু কেন জানি নে, শেষের দিকে হঠাৎ তাঁর শখ গেল বিলিতি কায়দা-কানুন অনুকরণ করতে। খুব সম্ভব তাঁর এবং রাজপরিবারের দু'একজন রোগীকে বিলিতি ডাক্তার সারিয়ে দিয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বেস জন্মে, বিলিতি আর পাঁচটা রীতি-নীতি আমদানি করলে গোটা দেশটার ধন-দৌলত বেড়ে যাবে। সাধারণ জন ভাবে, আমান উল্লাই বুঝি সর্বপ্রথম বিলেত-পাগলা রোগে আক্রান্ত হয়ে রাতা-রাতি দেশটাকে গোরা-সায়েব বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বস্তুত দু'একটা ব্যাপারে তিনি আমান উল্লারও এক তলা উপরে বসে বিলিতি খুশবাই-বিলাস উপভোগ করতেন। হবীব উল্লার হারেমটি ছিল বাছাই বাছাই সুন্দরীতে ভর্তি। কুল্লে আফগানিস্থানের তাবৎ কওমের তরো-বেতরো পরী হুরী দিয়ে তিনি হারেমটিকে করে তুলেছিলেন বহু বৈচিত্র্যময় গুল-ই-বাকাওলীর গুলিস্তান। জানি নে, কি করে তাঁর নজরে পড়ে, রাশান ব্যালে নর্তকীদের কিছু ফটোগ্রাফ এবং রঙিন ছবি। বড়ই পছন্দ হল তাঁর হাঁটুর ইঞ্চি ছয় উপর হঠাৎ যেন ছেঁটে দেওয়া সাতিশয় শর্ট স্কার্ট। হারেমের অপেক্ষাকৃত তরুণীর

পালকে তিনি সেই বেশে সাজিয়ে দিয়ে এক অজানা-অচেনা ভিনদেশী আনন্দ-দায়ী চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করলেন।

হারেমের ভিতর কি হয় না হয় সে নিয়ে মোল্লা সম্প্রদায়ের মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু তবু এই বিজাতীয় বেশ—বেশাভাবও বলা চলে—উৎকট পল্লবিত বর্ণনাসহ তাঁদের কানে পৌঁছল। মোল্লাদের ভিতর রাজদ্রোহী মনোভাব দেখা দিল। সেইটেকে প্রথম উস্কিয়ে দিয়ে নসুর উল্লা হয়ে গেলেন তাঁদের প্রিয়পাত্র। বহু বিচিত্র কৌশলে আমান উল্লার মাতা নসুরকে হটিয়ে করে দিলেন আমান উল্লাকে তাঁদের প্যারা। আখেরে হবীব উল্লা আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

আমান উল্লাও ঐ একইরূপে রাজ্য হারালেন। তাঁর মাতা, অসাধারণ বুদ্ধিমতী রমণী গোড়ার থেকেই বাবাজীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, "আর যা করবার করিস, বিলিতি সং সাজিসনি।" হবীব উল্লাকে তাতিয়েছিল ছবি, ফোটো; আমান উল্লাকে খেপিয়ে দিল বিলিতি সিনেমা। কাবুলের সিনেমা হলে আমি যে সব রদ্দি ছবি দেখেছি সেগুলোর অনেকগুলো, সে আমলে তো নয়ই, এ আমলেও বোধ হয় উভয় বঙ্গের সদাশয় সেন্সর দেখবারই সুযোগ পান না। মঞ্জুরী না-মঞ্জুরীর কথাই ওঠে না।...প্যারিসের বুলভার, লণ্ডনের পিকডেলি সার্কাসের স্বপ্ন দেখছিলেন আমান বিলেত যাবার পূর্বেই। আচম্বিতে বাস্তবে নেমে মালুম হল, সিংহাসন নেই, তিনি পিতৃনগর কান্দাহারের পথমধ্যে দাঁড়িয়ে।

যুবরাজ ইনায়েৎ রাজা হলেন। একে তো তখ্‌ৎ তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি, তদুপরি তিনি শরিয়তের এমন কোনো বিধান ভঙ্গ করেন নি যে তাঁর বাদশা হতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা। কিন্তু শোর বাজারের হজরৎ রাজী হলেন না। ইনায়েৎ উল্লাকে কিন্তু তখ্‌ৎ-মুল্‌ক ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। তিনি প্লেনে চড়ার সময় স্বয়ং শোর বাজার এ্যারপর্টে হাজির ছিলেন। সে প্লেন আকাশে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরৎ রানউয়ের উপর দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আজান দিলেন। সময়টা কোনো নমাজের আসন্নকাল নয়। আজানটা প্রতীক; "আফগানিস্থান থেকে কুফ্‌রের শেষ চিহ্ন ঝেঁটিয়ে বের করা হল।" আমার ভালো লাগে নি।

সেই প্যাটার্নের পুনরাভিনয় হল চুয়াল্লিশ বৎসর পর। সদ্র দাউদ সিংহাসনচ্যুত জহির পরিবারের অধিকাংশ জনকে প্লেনে করে বিদেশ চলে যেতে দিয়েছেন। বিবেচনা করি, এবারে কোনো আজানধ্বনি উচ্চারিত

হয় নি। এই যা তফাৎ! এই তফাৎটুকু থাকাতেই "পরিবর্তন"টা চোখে আঙুল দিয়ে "অপরিবর্তনীয়ের" দিকে নির্দেশ দিল। প্র্যা সা শাঁজ—ইত্যাদি।

রিপাব্লিক!

বাংলাদেশ ভারত উভয়ই দাউদী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—আপনার আমার বলবার আর কি থাকতে পারে, কিন্তু ঐ রিপাবলিকের ঢেঁকিটা গিলতে আমি অক্ষম এবং অনিচ্ছুক। বলা নেই, কওয়া নেই, কাবুলীর সেই কাঁঠাল-খাওয়ার কাহিনী থেকে কাঁঠাল বের করে অকস্মাৎ আমার মাথায় ফাটানো! কবেকার সেই ১৯৩০।৩১ থেকে অদ্যাবধি কেউ তো কখনো রিপাবলিকের কথা পাড়েনি। সর্দারদের সবাইকে জিরোতে দিয়ে রাজা জহির যখন খানদানী ফিউডেল ঐতিহ্য ভঙ্গ করে গেরস্ত ঘরের ছেলে ডকটর ইউসুফকে প্রধানমন্ত্রী করলেন তখন তো রাজা দেশটাকে গণতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন—কই, তখনো তো কেউ রিপাবলিকের কথা তোলে নি। দাউদও ইউসুফকে মদদ দেবার তরে হিন্দুকুশ উত্তোলন করেন নি। তিনি উষ্মাভরে গোসসা ঘরে ঢুকে খিল দিলেন—গোড়াতে। পরে কি কি করলেন সেইটেই তো বিশ্ববাসী জানতে চায়। জানবে নিশ্চয়ই, একদিন।

রিপাবলিক, জমহুরিয়া যে নামে খুশী ডাকুন, পুরানো সেই হুঁকোটা এখন অবধি সেই ডাবা-হুঁকোটাই রইল॥

শ্রাবণ হয়ে এল ফিরে

হঠাৎ শেষরাত্রে নামল আধো-আধো বৃষ্টি—রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্। সঙ্গে সঙ্গে পুরবৈয়া হাওয়া জানলার পর্দাটাকে যেন নৌকোর ঝুলে-পড়া পালটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করে দিল পূর্ণাঙ্গী। মাঝে মাঝে বারিপতন ক্ষান্ত দিচ্ছে, কিন্তু পুরবৈয়া হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ সমুদ্র থেকে, তরঙ্গিত নদীধারার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলায় দোলায় যে-বাতাস উত্তর পানে পাড়ি দিয়েছে মানস সরোবরের তীর্থযাত্রায়—সে আমারই বাড়ির এক কোণে বেণুবনে পুরবৈয়া হাওয়াকে, গত বর্ষার দীর্ঘ বিরহের পর ঘন ঘন আলিঙ্গন করছে। বেণুবনের পাতায় পাতায় মৃদু কূজন-গুঞ্জন-মর্মর আমার মর্মে যেন বিলোল হিল্লোল তোলে ক্ষণে ক্ষণে। দখিন হাওয়া বইতে শুরু করেছিল মৃদু মৃদু, ভয়ে ভয়ে, কবে সেই শীতের শেষে। হিমালয়ের হিমানীমাখা নিঠুর শীতল উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই দিতে গিয়ে সে ভীরু হার মেনেছিল প্রথম অভিযানে—হুহু করে আবার দীনদরিদ্রের সর্বাঙ্গে কাঁপন তুলে ধেয়ে গিয়েছিল উত্তরী-হাওয়া দক্ষিণ থেকে দক্ষিণতর দিকে, যেন পলাতক, দখিন হাওয়ার বর্জিত রাজ্যে সম্মার্জনী সঞ্চালন করতে করতে। দখিন হাওয়া কিন্তু মনে মনে সান্ত্বনা মানে; জানে, একা সে-ই ভীরু নয়, তার চেয়েও ভীরু আছে, একটি ক্ষুদ্র পুষ্প—মাধবী। উত্তরের বাতাসকে শেষ অভিযানে সম্পূর্ণ পরাজিত করে আবার সে যখন বনে বনে আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ডালে ডালে তার বিজয় পতাকার কুসুম-কুসুম গরম পরশ বুলিয়ে দেবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে পারুল পলাশ পারিজাত, করবী দেবে সাড়া, বকুল পাবে ছাড়া, শিরীষ উঠবে শিউরে, চমকি নয়ন মেলি চামেলি রইবে তাকিয়ে, অপলক দৃষ্টিতে। তবু ভীরু মাধবীর দ্বিধা যায় না, দক্ষিণ পবনের প্রতি-বিজয় অভিযানের পরও, আঙিনায় এসে যেন থমকে দাঁড়ায়—কিন্তু ঐ ভীরুটি, ঐ শঙ্কিতা-হিয়া কম্পিতা-প্রিয়া না এলে তো উৎসব অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গেয়ে ওঠে সবাই সমস্বরে :

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে
মন কেন গেল ঠেকি॥

দেখেছি, দেখেছি, সব দেখেছি যুদ্ধশেষের প্রথম বসন্তে। দখিন বাতাস বসন্তে ঘুরে মরে একা একা। তারপর আকাশে শুরু হয়

গুরুগুরু—গ্রীষ্মের দহন দাহ সাঙ্গ হয় যখন। নেমে আসে বারিধারা আর তখন বায়ু বয় পূরবৈয়া। দুই পবনে ঐ বেণুবনে হয় তাদের পুনর্মিলন।

অমা যামিনীর অন্ধকার। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে আর কোনো শব্দ নেই—শুধু মৃদু ঝর্ঝরে ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ বরিষণ—রিম ঝিম রিম ঝিম। কখন যে বর্ষণ শান্ত হয় বুঝতে পারি নে। বাঁশের পাতার ভিতর দিয়ে পুব-দক্ষিণের বাতাস তোলে একই মর্মর ধ্বনি। এবারে এসে দেখি প্রতিবেশী তাঁর অশথ গাছটাকে কেটে ফেলেছেন। অশথের পাতা বাতাসের অতি সামান্য আভাস পেলেই আমাকে শোনাতো সারা দিনমান যেন ঝরণার গান। বাঁশবনের চেয়েও তার পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থরথর কম্পন দিয়ে ক্ষীণ বরিষণ ধ্বনির অনুকরণ করে রুদ্র তৃষা-তপ্ত বৈশাখের দ্বিপ্রহরে, নিদ্রাহীন ত্রিযামা যামিনীতে পীড়াতুর জনকে ঐ অশথ অকারণ ছলনা দেয় বার বার। এখানে নয়, বীরভূম, ছাপরা, আগ্রা দিল্লীতে যেখানে দিনের পর দিন পুরোপুরি গ্রীষ্মকাল কাটে তাম্রসম বিবর্ণ আকাশ-বাতাসের মাঝখানে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে নিরুদ্ধ নিরাশায়—তারপর আসে ধূসর পয়োধরহীন আষাঢ়, জনপদবধূ তাকিয়ে থাকে মায়ামমতাহীন দিকচক্রবালের দিকে, আসে শ্রাবণ—কোথায় সে বিরহী যক্ষের মেঘ-শ্রেণী যার দাক্ষিণ্য কঠিন পাষাণপ্রায় অম্বরকে মধুর মেদুর করে দেবে?—এমন সময় বাতায়নপাশে, মৃদু পবন যখন অশথ-পল্লবে মর্মরধ্বনি তুলে বর্ষণের ঝিরিঝিরি রব অনুকরণ করে ধ্বনি-মরীচিকার নিষ্ঠুর মোহজাল পেতে কাতরজনকে ছলনা করে, তখন কবিগুরুর সর্বশেষ কবিতা আসে স্মরণে, তার পরিপূর্ণ রুদ্র অর্থ নিয়ে—

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে।"

থাকুন দিল্লী, আগ্রা, দূরেই থাকুন তাঁদের বিরাট সৌধ বিপুল বৈভব নিয়ে। আর, আর ঐ 'মিথ্যা বিশ্বাসের বিচিত্র ছলনাজাল' নিয়ে। আমার এখানে, এই নির্ধন দেশে, সেই সুধাধারা আবার আসুক, আষাঢ় আকাশ ছেয়ে, এসো বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।

আর আমার দুই আঁখি যাক হারিয়ে সজল ধারায় ঐ ছায়াময় দূরে, ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে, ভরা গাঙের কূলে কূলে, দেশ থেকে দেশান্তে, হয়তো বা জরাজীর্ণ এ জীবনের শেষপ্রান্তে।

ঐ নেমেছে; এবারে কিন্তু ঝমাঝম বিষ্টি। বিষ্টি আর বিষ্টি। বেণুবন-

মর্মর, ছিন্ন কদলীপত্রের ঝর্ঝর সব ছাপিয়ে দিয়ে। এবারে আর কোনো ছলনা নয়। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ-ভারে নুয়ে পড়া আকাশ নীরন্ধ্র অন্ধকারে বিলুপ্ত হয় নি। আমারই মত নিদ্রাহীন চোখ নিয়ে রাজ-পথের যামিনী-জাগরিনী দিবান্ধ প্রদীপমালার বিচ্ছুরিত জ্যোতি আকাশের নিম্নপ্রান্তে আতাম্র আরক্ত মৃদু প্রলেপ দিয়ে আলোকিত করে রেখেছে। গ্রামাঞ্চলে দূর ভিন গাঁয়ে আগুন লাগলে যে রকম তার লালচে আভা পশু-পক্ষীর প্রাণেও আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

হ্যাঁ, আতঙ্ক। হিটলারও এই রকমেরই এক অনৈসর্গিক চন্দ্রালোকের বিবরণ শুনে শঙ্কাতুর কণ্ঠে শুধিয়েছিলেন, "কৃত্রিম চন্দ্রালোক? সে আবার কি?"

নিত্য দিনের প্রথানুযায়ী দ্বিপ্রহরে সামরিক মন্ত্রণাসভার দিবসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিম-উত্তর রণাঙ্গণে মন্টগমেরি তখন হল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে হামবুর্গ পানে এগোচ্ছেন। সে রণাঙ্গণে শত্রু-মিত্রের অগ্রগতি, পশ্চাৎ অপসরণ, তাদের বর্তমান ঘাঁটি ইত্যাদির সর্বশেষ প্রতিবেদন বলে যাচ্ছেন বিরাট ম্যাপে অঙ্গুলি নির্দেশ করে করে আঞ্চলিক এ্যাদর্কা। বলতে বলতে তিনি উল্লেখ করলেন, 'অতিশয় অন্ধকার রাত্রি। এ রাত্রে মন্টগমেরীর পক্ষে আক্রমণ করা অসম্ভব। হঠাৎ বিরাট রণাঙ্গণ আলোকিত হল কৃত্রিম চন্দ্রালোকে—'

বিস্মিত হিটলার এ্যাদ্-এর কথা মাঝখানে কেটে দিয়ে শুধোলেন, "কৃত্রিম চন্দ্রালোক! সে আবার কি?" ধূম্রজাল, কুয়াশা বহুকাল ধরে রণ-কৌশলে সুপরিচিত কিন্তু কৃত্রিম চন্দ্রালোক!

এ্যাদ: "পূর্বেই বলেছি, রাত্রি ছিল অত্যন্ত অন্ধকার। অমাবস্যার রাত্রেও নুয়ে-পড়া রাশি রাশি মেঘ না থাকলে নীরন্ধ্র অন্ধকার সৃষ্ট হয় না। মেঘগুলো ছিল তুষার ধবল। মন্টগমেরি এ্যারপ্লেন-অন্বেষণকারী সব কটা সার্চলাইট মেঘের উপর তাগ্ করতে আদেশ দিলেন। সার্চলাইটের তীব্র রশ্মি মেঘে মেঘে প্রতিবিম্বিত হয়ে অত্যুজ্জ্বল যে-আলো সৃষ্টি করলো সেটা মেঘমুক্ত পূর্ণিমার মত।"

এখানে বর্ষা নামে তার ঘনতম ঘনাবরণে। মাঝে মাঝে পশ্চিম থেকেও বৃষ্টি আসে—সে বৃষ্টি অতিদূর আরবসাগর থেকে বেরিয়ে এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে দুর্বল হয়ে যায়। তাই বিরহী যক্ষ যে-রামগিরি জনকতনয়ার স্নান-পুণ্যোদকে অভিষিক্ত হয়েছিল তারই উপরে দাঁড়িয়ে মেঘপুঞ্জকে অনুরোধ

করেছিল, 'আমার বিরহবার্তা নিয়ে তুমি, হে মেঘ, অলকায় গমন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করো। কিন্তু আমি জানি, তুমি দয়াশীল দাতা। যে-সব ভূখণ্ডের উপর দিয়ে তুমি ভেসে যাবে সেগুলি নির্মম গ্রীষ্মের অত্যাচারে বিবর্ণ শুষ্ক দগ্ধপ্রায়। কাতর নয়নে জনপদবধূ ঊর্ধ্বে তোমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবে, বারিধারা ভিক্ষা চেয়ে। আমার অনুরোধ, নিজকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করো না, বিরহিণী প্রিয়াকে আমার সন্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত।"

যে শ্যামাম্বুরাজি যক্ষের কাতরতা শুনতে পায় নি তারা অলকার দিকে না গিয়ে মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, রাঢ়ভূমিতে বিগলিত আত্মদান করতে করতে যখন দীর্ঘ যাত্রাশেষে এই পুণ্যভূমিতে পৌঁছয়, তাদের সঞ্চয় সেকালে প্রায় নিঃশেষ! কিন্তু, ভো ভো বর্ষণ-ক্লান্ত দূরদেশী মুসাফির! আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট। যত অল্পং তদ মিষ্টং। তোমার পদধ্বনি পূর্বাঙ্গণে, পূর্বদেশে নন্দিত হোক।

ঐ, ঐ যে বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে, আঁচলখানি দোলে। বাতাসে বাতাসে বর্ষণসিক্ত জলভরা কণ্ঠে ভেসে আসছে ভোরের আহ্বান। সাধ যায়, এই বর্ষণ মুখরিত নগরীর উপকণ্ঠ পেরিয়ে দেখে আসি, বুড়ীগঙ্গায় কতখানি জল বাড়লো।

না, আমাকে কেউ যেতে দেবে না। এ বয়সে। বয়সের শেষে।

মনে পড়ল এক জাপানী কবির করুণ শেষ প্রশ্ন। ক্ষয়রোগে তিনি যাত্রার শেষপ্রান্তে প্রায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল, প্রতি বৎসর বাতায়নপাশে বসে অবিরল বরফপাত দর্শন। বরফ জমে উঠছে, মাঠে-ঘাটে-বাটে, জমে উঠছে, জমে উঠছে। তিনি দেখছেন, আর দেখছেন।

কিন্তু এবারে তুষার-বর্ষণ দর্শনার্থে তাঁর বিছানাতে উঠে বসাও কঠিন বারণ। মাঠ-বাট দেখতে পাচ্ছেন না। জাপানী তিন কলির হাইকাই পদ্ধতিতে রচা তাঁর শেষ কবিতা রেখে গেছেন তিনি :—

শুধায়েছি বার বার, কত বার!
হায়, শুধু প্রশ্ন—এ আমার,
এবারেতে কত উঁচু হয়েছে তুষার?
হাউ অফটেন,
হ্যাভ আই আসকট
হাও হাই ইজ দি স্নো??

ডানপিটে হুঁদে

একাধিকবার পরাজিত হয়ে জহীর উদ্-দীন মুহম্মদ বাবুর মনস্থির করলেন, আপন পিতৃভূমি ফরগনা 'পীর মানে না দেশে খেশে, পীর মানে না ঘরের বউয়ে', নীতি অবলম্বন করে তাঁর প্রকৃত মূল্য নিতান্তই যখন সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না, তখন ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তর অভিযানই প্রশস্ততর। এ-যুগে, কিন্তু কি তুর্কমানিস্থান, কি আফগানিস্থান সর্বত্রই ভাগ্যান্বেষণকারীর সংখ্যা কমে আসছে। তার প্রধান কারণ, সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে যে গুণটি মাত্রাধিক, অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজন তার নাম আত্মবিশ্বাস। এ-যুগের সব চেয়ে নাম-করা এডভেনচারার আডলফ হিটলার চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঐতিহাসিক, কূটনৈতিক, সংগ্রামবিদ, মনস্তাত্ত্বিক, অতিশয় সীমিত সংখ্যক তাঁর অন্তরঙ্গ জন এ্যাদ-দর্কা সেক্রেটারি স্টেনো পরিচারক ভ্যালে —এমন কি তাঁর বৈরিকুল পর্যন্ত এক বাক্যে তাঁর সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান যে-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন সেটি তাঁর আত্মবিশ্বাস। তাঁর অবিচল সদাজাগ্রত প্রত্যয় ছিল, নিয়তি (প্রভিডেন্স) তাঁকে নির্বাচিত করেছেন, জর্মানির ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। পরাজয়ের পর পরাজয়, পুনরপি পরাজয়,—তথাপি তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং সর্বশেষ সংগ্রামে তিনি বিজয়ী হবেনই হবেন সে প্রত্যয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলছিল তাঁর জীবনান্ত পর্যন্ত। তাঁর অতিশয় অন্তরঙ্গ, নিত্য সহচরগণ বিস্মিত অবিশ্বাসের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর কল্পনাপ্রসূত স্বকৃত অনৈসর্গিক আত্মবিশ্বাসের এই ইন্দ্রজাল। বস্তুত তিনি ঠিক কোন্ মুহূর্তে পরাজয় স্বীকার করে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হলেন সেটা চিরকালই অভেদ্য রহস্য থেকে যাবে।...জহীর উদ্-দীন বাবুরের আত্মবিশ্বাস হিটলারের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কিন্তু বাবুরের সহচরদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাসের প্রতিনিয়ত বর্ধমান দার্ঢ্য লিপিবদ্ধ করার মত লিপি-কৌশলী কেউই ছিলেন না, অপরঞ্চ বাবুর অতিশয় সযত্নে রোজ-নামচার মাধ্যমে তাঁর আত্ম-জীবনী রেখে গিয়েছেন; ওদিকে হিটলার এ ধরনের "অপকর্ম" রীতিমত বিপজ্জনক বলে মনে করতেন এবং তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, "যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা একান্ত একা-একাই করে, সফলতা কামনা করতে পারে একমাত্র সেইই"।

দলপতি মাত্রই আর্টিস্ট্

এই সব এডভেনচারারদের সম্বন্ধে এতখানি সবিস্তর লেখার কারণ এই যে, পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় এ ধরনের লোক এখনও লুপ্ত হন নি। এঁদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল হতে হলে এঁদের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে হয়। এডভেনচারার হওয়া মাত্রই এঁদের সর্বপ্রথম কর্ম হয় সাঙ্গোপাঙ্গ যোগাড় করা। ঐতিহাসিক মাত্রেরই বিস্ময়ের অবধি নেই, চব্বিশ বছরের "অপদার্থ" যে-ভ্যাগাবণ্ড স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে ম্যুনিকে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে পূর্ববৎ আশ্রয়-সম্বলহীন ট্র্যাম্প, সে কি করে তার চতুর্দিকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে হরেক রঙের চিড়িয়া যোগাড় করে ফেলল? এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, তার ভিতর ছিলেন সে যুগের দুই নম্বরের জঙ্গীলাট জেনারেল লুডেনডর্ফ। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আমরা যে "আত্মবিশ্বাস" নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি, দ্বিতীয় পর্যায়ে পাই তারই বাহ্য প্রকাশ। এখানে দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষীকে আর্টিস্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। আর্টিস্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঋষি তলস্তয় বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন অনুভূতি অন্যজনের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারে সে আর্টিস্ট্।" হিটলার তাঁর আত্মবিশ্বাস যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীতে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সঞ্চারিত করবার মত অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন সে সত্য তাঁর নিকটবর্তী প্রচ্ছন্ন শত্রুরা পর্যন্ত নিরতিশয় ক্ষোভ ও উষ্মার সঙ্গে স্বীকার করেছেন···বাবুরের সে টেকনিক বিলক্ষণ আয়ত্তাধীন ছিল, তদুপরি ভাগ্যান্বেষণের অরুণোদয় থেকেই তাঁকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে হয়েছে। অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে রণাঙ্গনে যেখানেই সঙ্কটময় অবস্থা সেখানেই তিনি নির্ভয়ে তীরবেগে উপস্থিত হয়েছেন, যে কারণে একাধিক পরাজয়ের পরও দূরদর্শীজন তাঁকে পরিত্যাগ করে নি।

সাবধান! ভেজাল চিনে নেবেন!

অদ্যকার ভুট্টো, ইরানের শাহ—বাবুরের তুলনায় শিশু। নিতান্তই যোগাযোগ এবং হতবুদ্ধি মজ্জমান জুন্তার শেষ ত্রাণ-তৃণ-খণ্ডরূপে প্রথম জনের কর্তৃত্ব লাভ, দ্বিতীয়জনও দ্রুতবেগে পলায়নের পর অবশেষে রুশের সদয় নিরপেক্ষতা ও ইংরেজের প্রতি নতিস্বীকার, এই দুই গ্রহের যোগাযোগের ফলে আপন পূর্ব সত্তায় প্রত্যাগমন! আমার মনে লয়, কৈশোরে চতুরঙ্গ

খেলায় গজচক্র অশ্বচক্র বড়েচক্র পুনঃ পুনঃ ঢেঁকিবৎ ভক্ষণ করার পর, আপন আপন দেশে যখন গেলবার মত আর কোনো ঢেঁকি কোনো চাষী বউই তামাশা দেখবার তরেও দিতে রাজী হল না, তখন দুজনাই সহজতর কূটনীতি-চতুরঙ্গ-অঙ্গণে রঙ্গ-ব্যঙ্গে সঙ্গ দিলেন। —একে অন্যকে।

নিক্সন আর পাঁচটা ভুঁইফোঁড় মার্কিনের মত 'খানদানী মনিষ্যিদত্ত' বাদশাহী হাতের পিঠ চাপড়ানোটা পাবার তরে হামেহাল বড্ডই ছোঁক ছোঁক করেন। তদুপরি, আড়াই-তিন হাজার বছরের প্রাচীনস্য প্রাচীন রাজসিংহাসনে আসীন—জানি নে, হয়তো কুল্লে দুনিয়ার প্রাচীনতম মনার্কি, যদ্যপি বর্তমান শাহটির পিতামহ-প্রপিতামহের প্রস্তাব তুলছি নে—সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলে শাহ-ইন-শাহের অনুগতজন অকস্মাৎ সাময়িক স্মৃতিস্তম্ভন বা আংশিক বধিরতায় আক্রান্ত হন। সর্বোপরি প্রশ্ন, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন পেহলভি (সংস্কৃতে পহ্লবী) খেতাব হঠাৎ করে ভুড়ভুড়ি দিয়ে উঠলো, কোন্ রসাতল থেকে? একদা যে রকম তারই অক্ষম অনুকরণে গওহরী মহিমায় আড়াই-তিন হাজার বছরের পুরনো গান্ধার (প্রাচীন পেশাওয়ার-জালালাবাদ অঞ্চল) ফান্দার আমাদের মত গাঁইয়া বেকুবদের চমক লাগবার তরে মরা লাশে ভূতের মত চাড়া দিয়ে উঠেছিল? এর খাতিম উল্-খিতাব হয়, যদিস্যাৎ অকস্মাৎ সদর-ই-আলা ভুট্টো। তাঁর এলাকার পঞ্চ সহস্রাধিক বর্ষীয় মোন-জো-দড়োর বলদ-মার্কা সীল সেঁটে কিছু একটা পাঁচহাজারী মনসব তলব করে তাবৎ পাপী-তাপী-পাকীজনকে শরীফ উল্-আশরাফ খানদানে তুলে নেন।

প্রাণনাথ ডাকো

শ্রুতিধর পাঠক! অস্বীকার করতে পারবে না, এই মাত্র সেদিন আমি তোমাকে ফেয়ার ওয়ার্নিং দিয়েছি, গুলতানী না করতে পারলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এবং আপসোসের কথা, বর্তমান গুলটি খুব সম্ভব তোমার ন'সিকে চেনা। কিন্তু পাঠক, আমরা সব্বাই চেনা জন, চেনা জিনিসকেই কি বেশী পছন্দ করি নে? মেলায় গিয়ে চেনা জনের মুখ খুঁজি, অচেনা লাই-ব্রেরীতে ঢুকলে তার দাম যাচাই করি চেনা বইয়ের সন্ধান নিয়ে, গোরস্তানে খুঁজি মরহুমদের চেনা নাম। তবু অতি সংক্ষেপেই সারছি। বাঙ্গাল গেছে শেয়ালদ বাজারে ঘটির তরকারি পট্টিতে। "বাইগনের সের কত?" ঘটি হেসে কুটি কুটি। "বাইগন! কি কইলে, মাইরি!" বাঙ্গাল—চটিতং:

"ক্যান, কইছি তো কইছি, অইছে কি ?" ঘটি : "ছোঃ! কিবা নাম, বাইগন! বেগুন—আহা, কী মিষ্টিই না শোনায়!" বাঙ্গাল—উচ্চহাস্যে : "হঃ! মিষ্টি নামেই যদি ডাকবা তয় 'প্রাণনাথ' ডাকো না ক্যান ? স্থার কত প্রাণনাথের ? ভাঙ্গর ভাঙ্গর প্রাণনাথ গুলাইন ?"

শাহ, গওহর, গদ্দিটা আরেকটু দড় হলে মিস্টার ভুট্টোও—সবাই এ নীতিতে আমাগো "প্রাণনাথ নীতির" প্রবর্তক প্রাণনাথ বাঙ্গালের অতিশয় অনুগত বশম্বদ শাকরেদ। "খানদানী খেতাবই যদি লইবা, তয় লণ্ডনা কইল-জাভা ভইরা পুরানার পুরানা, হিডারও পুরানা খানদানী খেতাব।" হিটলারও বলেছেন, "মিথ্যে যদি বলতেই চাও তবে পাতি মিথ্যে বলো না। বলো পাঁড় মিথ্যে · ইয়াব্বড়া-বড়া কেঁদো কেঁদো মিথ্যে। মিথ্যেটা যত বিরাট কলেবর হবে, পাবলিক গিলবে সেটা তত সহজেই।"

নিক্সন শাহ'-এর মেহেরবানী পেয়ে বে-এক্তেয়ার। কোন্ চাঁড়াল বামুনের হাতে দৈবযোগে পৈতে পেলে—বুদ্ধু জানবে কি করে, বিটলেটা খাঁটি নদীয়ার মাল, না জিঞ্জিরা-মার্কা ভেজাল—উল্লাসে নৃত্য ভরে ধানের মরাই খুলে দেয় না? অবশ্য নিক্সনের মুক্ত হস্তে ট্যাঙ্ক, প্লেন ঢালার অন্য কারণও আছে। কিন্তু তাঁর গোড়ার গলদ, শাহকে একটা মস্ত বড় এডভেনচারার বলে ধরে নেওয়া।...বরঞ্চ সদর দাউদের যা-হোক তা-হোক একটা ক্যালিবার আছে। লোকটা এডভেনচারার এবং গ্যামবলার। অসম্ভবের আশায় তিনি সম্ভাবনীয়-টাকে বাজী ধরতে রাজী আছেন।

ঐতিহাসিক দাবী

এবারে আমি যা বলতে যাচ্ছি, সেটা কোনো ঠাণ্ডা-মগজের লোক বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু যে সত্য আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ যে সত্যের সমর্থন আমি দীর্ঘকাল ধরে পেয়ে এসেছি সেগুলো এই দাউদ-সুবাদে আমাকে বলতে হবে। বিশ্বাস না করলে কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

(১) ১৯২৭ সালের গ্রীষ্মকালে আফগান স্বাধীনতা দিবসে (জশ্‌ন্‌-এ) জনগণ তথা কাবুলস্থ সর্ব রাজদূতের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য গণসভায় আমান উল্লা ঘন ঘন করতালি হর্ষধ্বনির মাঝখানে নানা কথার মাঝখানে সদম্ভে সগর্বে বলেন, "সিকন্দর শাহ পাঞ্জাব জয়ের পর বিরাট ভারত দখল না করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলো কেন ? কারণ, "আমরা—আফগানরা—তার 'লেজ কেটে

দিয়েছিলুম' বলে," অর্থাৎ আফগানরা আলেকজাণ্ডারের লাইন অব কম্যুনিকেশন কেটে দিয়েছিল! বিগলিতার্থ: আফগান জাত সিকন্দর-বিজয়ী।

(২) আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস কোনো আফগান লিখেছেন কি না জানি নে। যে অর্বাচীন ইতিহাস কাবুলের ইস্কুল কলেজে পড়ানো হয় তার পনরো আনা, ভারতের গবেষণা-জাত ভারতে লিখিত ইতিহাস থেকে আফগানাংশ কেটে বের করে, আফগান জাতির গৌরব-গরিমা শতগুণ বৃদ্ধি করে স্থূল হস্তে প্রলেপ লাগানো দম্ভোক্তি।

(৩) সাধারণ আফগান নিরক্ষর। কাবুল কান্দাহারের স্কুলবয় 'সে-ইতিহাসের' দু'পাতা পড়ে বিশ্বাস করে, ভারতে ইংরেজাধিকার না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভূখণ্ড ছিল আফগানিস্থানের কলোনী, জমিদারী—যা খুশী বলতে পারেন। মোদ্দা কথা: মুহম্মদ ঘোরীর আমল থেকে, বিনয় যাদের ভূষণ নয়, তাদের মতে গজনীর মাহমুদের কাল থেকে ইংরেজ কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত আফগানিস্থান হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করেছে, সাতশ', মতান্তরে হাজার বৎসর ধরে। হ্যাঁ, কোনো কোনো আফগান রাজা দিল্লী আগ্রায় কিছুকাল বাস করেছেন বটে। যদি বলা হয়—আর বলবেই বা কোন্ উন্মাদ—বাবুর তো তুর্কোমান, তিনি তো পাঠান বা আফগান নন, তবে অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সরল উত্তর: বাবুর ছিলেন কাবুলের রাজা। সেই কাবুল-রাজ দিল্লী জয় করেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় আদেশ দেন, তাঁর মৃতদেহ যেন তাঁর "রাজধানী" কাবুলে গোর দেওয়া হয়। এর পর আর কি প্রমাণ চাই? বাবুর যে কাবুলের রাজা ছিলেন, সেটা তো তর্কাতীত! পরের মীমাংসাগুলো প্রথম সিদ্ধান্ত থেকে পিল পিল করে বেরোয়।

(৪) ইংরেজ কর্তৃক ভারত শাসন একটা অতি আকস্মিক অতিশয় সাময়িক দুঃস্বপ্ন মাত্র। আফগানিস্থান পুনরায় তার হক্কের উপনিবেশ জয় করবে। ঘোরী, গজনবী, লোধী (লোদী) এ সব কওম, তাদের বাসভূমির নাম, এখনো কাবুলে নিত্যদিনের কাজকর্মে কথাবার্তায় ফিরে ফিরে আসে; হিন্দুস্থানে এ সব ইতিহাসের শুষ্কপত্রে মুদ্রিত নামমাত্র। সরকারীভাবে প্রচারিত পাকিস্তানই বা কি, আর ভারতই বা কি, আর বাংলাদেশই বা কি? আসলে সব কটা মিলে ওটা অখণ্ড হিন্দুস্থান (ভারতের কট্টর সাম্প্রদায়িকবাদীরা এতচ্ছ্রবণে অবশ্যই নিরতিশয় উল্লাস বোধ করবেন!)। সেইটে আমাদের প্রাপ্য।

(৫) সরদার দাউদ খান কাবুলের ওয়ারিসানের এই "অতিশয় সীমিত

বিনয়ভরে নমিত” দাবী-দাওয়ায় কতখানি বিশ্বাস করেন, জানি নে, কিন্তু তিনি যে-দশ-বৎসর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় স্বাধীন, বিকল্পে আফগানিস্থানের প্রদেশরূপে পখতুনিস্তান এবং পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে করাচী অবধি করিডরের (পুরো-পাক্কা সরকারী ওয়ারিসানসূত্রে) পুনঃপুন দাবী জানিয়ে তথাকথিত ইতিহাসপুষ্ট স্কুলবয়দের ভ্যাম ফেভরিট হয়েছিলেন সেটা সর্ববাদীসম্মত। সে সব বয়-রা এখন ‘ইসটুডিনট’ এবং ফৌজী ‘আপিসর’—এরাই নাকি দাউদের প্রধান সহায়ক।

আমি জানি, আসমুদ্র হিমাচল আফগানের এই দাবী, গৃহে প্রত্যাবর্ত আবুহোসেনের তখৎ দাবীর মত বুদ্ধির অগম্য, হাস্যস্কর বলে মনে করবে। তা হলে স্মরণ করিয়ে দিই প্রায় একশ’ বছর ধরে তৎকালীন ভারত-রাজ ইংরেজের সমুখে কাবুল-রাজ কখনো লাহোর মুলতান কখনো পেশাওয়ার আটক্ অবধি দাবী করেছেন। ইংরেজের কাছে তখন ঠিক আজকের মত ঐ রকম ‘দাবী’ বুদ্ধির অগম্য, হাস্যস্কর বলে মনে হয়েছে।

আর সত্যি বলতে কি, কোন্ দেশে এ ধরনের দাবীদার একদম নেই? তারতম্য শুধু সংখ্যাতে এবং দাবীর চৌহদ্দী নিয়ে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে আমরা বুক ফুলিয়ে গেয়েছি, এখনও যে একেবারে ভুলে মেরে দিয়েছি তাই বা কিরে কেটে বলি কোন হিম্মতে—

> “একদা যাহার বিজয় সেনানী
> হেলায় লঙ্কা করিল জয়!”
>
> হেলায়!!

হাইকোর্ট দর্শনস্য দর্শনং

“বাঙ্গালের” হাইকোর্ট দর্শনের তবু একটা অর্থ আছে। কিন্তু যখন ইয়োরোপীয় এবং বিশেষ করে মার্কিন-বাঙ্গাল কলকাতা বা কাবুলের হাইকোর্ট দর্শনে যায় এবং সেখান থেকে দারুণ দারুণ রগরগে রিপর্ট পাঠায় তখন ‘বাঙ্গালকে’ তসলিম জানাতে ইচ্ছে করে।

পূর্ব-বঙ্গবাসী একশ বছর ধরে জানতো, নোয়াখালি বা সন্দীপের সুদূরতম প্রান্তেও যদি খুন হয় এবং সদরের দায়রা-আদালতে যদি আসামীর ফাঁসির হুকুম হয়, তবে সে হুকুম কলকাতার হাইকোর্ট থেকে মঞ্জুরী না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ঝুলতে হয় না। রাঢ়ের তুলনায় পূব বাংলার গ্রামবাসী একটু বেশী

গরম মেজাজের হয়, তার আত্মসম্মান জ্ঞান একটু বেশী টনটনে। উচ্চশিক্ষিত শান্তিকামী নাগরিক এটাকে স্থলবিশেষে হিংস্র বলে মনে করতে পারে, কিন্তু আমার মত শক্তিহীন অর্থদীনকে দেশ-বিদেশে এত লাঞ্ছনা অবমাননা সক্ষোভে সহ্য করতে হয়েছে, এবং হচ্ছে যে, সে রগচটা বাঙ্গালের ধৈর্যচ্যুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সখা সুপক্ক বংশদণ্ডের অনুসন্ধান দেখে ঈর্ষাকাতর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবং অতি অবশ্যই তার মঙ্গল কামনা করে। সে কথা থাক। অতএব খুন-খারাবী দেখে দেখে অপেক্ষাকৃত অভ্যস্ত মিম্বর উল্লা বা গদাই নমশূদ্র পাকেচক্রে যখন কলকাতা যায় তখন যদি সে সেই ভবনটি দেখতে চায় যার গর্ভগৃহে প্রতিদিন স্থির করা হয়, কে ঝুলে ঝুলে লম্বমান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করবে আর কে-ই বা রোগশয্যায় মা-ধরণীর বক্ষ থেকে সমান্তরাল রেখাবৎ বিদায় নেবে, তখন আমি গাঁইয়া আশ্চর্য হব কেন? শহুরে কলকেত্তাই ব্যাপারটা আদৌ বুঝতে পারে না, কারণ তার সীমাসরহদের ভিতর তার অতি সুদূর ক্ষীণ পরিচিতজনের কাউকেই কণ্ঠদেশে রজ্জুবদ্ধাবস্থায় লম্ববান দেহে ইহলোক ত্যাগ করতে হয় নি কিংবা সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে হয় নি। সে হাইকোর্টের মর্ম বুঝবে কি করে? তাই হাইকোর্টের প্রতি "বাঙ্গালের" গভীর শ্রদ্ধা, তার দর্শন-লাভ, তীর্থ-দর্শনের সমতুল বিবেচনা করাটা নিয়ে ঘটি ঠাট্টা-মস্করা করে।...ঢাকাতে যখন হাইকোর্ট নির্মাণ আরম্ভ হয়, তখন আমার কী উল্লাস, কী নৃত্য! আমি তখন কর্তা-ব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ-উপরোধ করি—অবশ্য ফোন মেরায়তীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি পর্বতপ্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ নস্যবৎ—আমাদের হাইকোর্টটিকে যেন কলকাতার তুলনায় লাগসই জুৎমাফিক বেশ খানিকটে উচ্চতর পর্যায়ে রূপায়িত করেন—যাতে করে শ্যামবাজারের রকে বসে ঘটিদের সগর্বে আদেশ দিতে পারি, ঢাকা গিয়ে সেথাকার হাইকোর্ট দর্শনজনিত অশেষ পুণ্যার্জন করতে পারে! কেউ শুনলো না আমার 'উচ্চাদর্শের' প্রস্তাবটি! শুনলে কি হত? ঐ যে ১৬ ডিসেম্বর ১৯১১-এ হুদো-হুদো ইণ্ডিয়ান সেপাই হেথায় এসেছিল তারা আমাদের হাইকোর্ট দেখবার তরে মাথা উঁচু করতেই—ছাখ-তো-না-ছাখ—তাদের টুপি, পাগড়ী এস্তেক মণ্টি তক মস্তকচ্যুত হয়ে গড়াগড়ি যেত না? যে দু-চারটি শেষ কুট্টিবেরাদর এখনো লিকলিক করে বেঁচে আছে তারা সরেস সরেস গণ্ডাদশেক মস্করা-কিসসা বানিয়ে টেরচা নয়নের বাঁকা টিটকরি কেটে আপন জীবন ধন্য মেনে, স্বয়ং আপন জনাজার ব্যবস্থা করে দিয়ে কুট্টি বংশের শেষ প্রদীপটি ফুঁ মেরে নিভিয়ে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে পুলসিরাৎ

পেরিয়ে যেত না? শুনতে পাই, কলকাতার লোক আজ নাকি আমাদের হ্যানস্তা করে। করবে না? দাসীর কথা বাসি হলে ফলে। তখন যদি হাইকোর্টটা উঁচু করে বানাতে তবে— যাক গে।

মার্কিন খটাঙ্গ ভুটাঙ্গ পুরাণ

কড়ি আছে মার্কিনের। পয়লা ধাক্কাতেই তাঁরা হাজির হয়েছেন কাবুলে— হাইকোর্ট দেখতে। ঝটপট একাধিক রিপর্ট ভী তেনাদের কাগজে বেরিয়েছে। কুল্লে এক দফা চোখ বুলিয়েই পুনরায় সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করলুম, পৌনঃপুনিক "পরিবর্তনেও অপরিবর্তনীয়" খুদা-দাদ আফগানিস্থানের জিন্দাবাদ শহর-ই-আলা কাবুল। অর্থাৎ কাবুল তথা আফগানিস্থান আপাতদৃষ্টিতে যতই পরিবর্তিত বলে মনে হোক না কেন, একটু ঘষলেই উপরকার গিল্টি উপে যায়, আর বেরিয়ে পড়ে আসল দস্তা—খাজা মাল। তুলনা দিয়ে চোখের সামনে আনি, ফরেন মিনিস্টার ভুট্টো, হঠাৎ আইয়ুবের বিরুদ্ধে তাঁর চেল্লাচেল্লি, "গণতন্ত্র চাই, পিপলস পার্টিই পিপল, তাদের হুকুমেই চলবে দেশ", তারপর "অখণ্ড পাকিস্তান যে সংবিধানই তৈরী করুক না কেন (১৯১১ শীতকাল) পিপিপি সেটা মানবে না", তারপর ঢাকাতে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হলে "শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তান ইজ সেভড", তারপর "ভুল বলেছিলুম, এই পোড়ার দেশে গণতন্ত্র চলতে পারে না, চাই, সর্বাধিকারসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের একচ্ছত্রাধিপত্য"— ইত্যাদি ইত্যাদি, পাঠককে আরো উদ্ধৃতি দিয়ে বেকার বিরক্ত করবো না। মোদ্দা কথা, তিনি যত বার যত তরো-বেতরো ভোল পালটান, ভেক বদলান, খনে যাত্রার দলের ইয়া দাড়ি গোঁপ-ওলা নারদমুনি সাজেন, খনে কামিয়ে-জুমিয়ে চাঁচা-ছোলা শ্রীরাধার সাজ ধরেন, একটি ভেংচি কেটেছেন কি না কেটেছেন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন ডিকটেটর ভুট্টো, যিনি তাঁর কলোনি মরহুম পূর্ব-পাকের উপর একদিন-না-একদিন কুশী সর্দারের ডাণ্ডা বুলোবেনই বুলোবেন। একেই বলে পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে তাঁর মৌলা মুরশিদ মিয়া নিক্সন। এতখানি সবিস্তর বুঝিয়ে বলার কারণ: এদানির আমার এক মিত্র, আইনকানুনে পয়লা নম্বরী খলিফে বললেন, তাঁর ঘুঘু মক্কেলরা পর্যন্ত "পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়" তকমাটার অর্থ সঠিক ধরতে পারেন নি। এই নিয়ে তিনে কত্তি তিন, তিন দফে এফিডেভিট পেশ করা হল।

সেই ডাবা হুঁকো

মার্কিনী রিপর্টে যে-সব মোক্ষম মোক্ষম খবরের উল্লেখ মাত্র নেই তার থেকেই আমি সত্য নির্ণয় করেছি।

"নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথা পেতে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে॥"

গোরুর ল্যাজটা কাটা পড়ে যাওয়ায় সেখানে যে ঘা হয়, মাছিগুলো তারই উপর মোচ্ছব লাগিয়েছিল। মার্কিনী রিপর্টের দগদগে ঘা থেকে আমি অক্লেশে অনুমান করলুম, আদি ল্যাজটার আকার-প্রকার গড়ন-ঢং কি ছিল এবং তৎসহ যুগপৎ আরেকটি ফালতো তত্ত্ব আবিষ্কার করে আমি বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের সম্বন্ধে বড়ই শ্লাঘা অনুভব করলুম : মার্কিনী রিপর্টাররা নিতান্তই সস্তা মার্কিন-কাপড়; কাবুলের হাইকোর্টটা যে কোথায়, সে তত্ত্বটাও নিরূপণ করতে পারেন নি।

এনাদের এক মহাপ্রভু বলছেন, "প্রশস্ত ধূলিধূসরিত কাবুল উপত্যকার হেথাহোথা এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গাচোরা বুড্‌ঢা কাবুল শহর, সেই আদিকালের 'অপরিবর্তনীয়' চেহারা নিয়ে। কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে, মন। 'পরিবর্তন" এসেছে আগাপস্তলা প্রকম্পিত করে।"

বটে !! কী সে যুগান্তকারী খুনিয়া পরিবর্তনটি ?

"পূর্বে যেখানে ঢুলুঢুলু নয়নে আধো ঘুমে আধা-চেতন কাবুলী কাস্টমস্ কর্মচারী যাত্রীদের আধাখেঁচড়া তদারকী করে না করে হাতের অলস ইশারায় বিমানবন্দর থেকে তাদের বেরিয়ে যাবার পথ দেখিয়ে দিত, সেখানে" রোমহর্ষিত বিস্মিত মার্কিন বাঙ্গাল দেখলেন, "হাতে টমি-গান নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে যোদ্ধা (অশ্বারোহী কি না, বোঝা গেল না—লেখক) ট্যারমাকের উপর পাহারা দিচ্ছে, প্লেন থেকে নামবার পূর্বেই যাত্রীগণকে নিরাপত্তা-পুলিশ বাজিয়ে দেখে নিচ্ছে (ইন্সপেকট করে)।"

মার্কিনের বিস্ময় দেখে আমারও বিস্ময়ে বাক্যস্ফূরণ হচ্ছে না।

আচ্ছা, পাঠক তুমিই বলো, কোন্ সে মুল্লুক, হটেনটট বুশমেন যাদেরই হোক, যেখানে চল্লিশ বছরের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজাকে বরখাস্ত করে কু দে'তা হলে বিমানবন্দর, রেল ইস্টিশন জাহাজ বন্দর (কাবুলে এ দুটোই নেই), ছাউনি, থানা গম্নরহের সামনে তিন ডবল সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা হয় না ? পঁচিশের কথা বাদ দাও, আইয়ুব যখন মেনি-বেড়াল মার্কা কু করেছিলেন

তখন রাজধানীতে না, প্রাদেশিক শহরিকা ঢাকা, তারো নিচের সিলেট কুমিল্লায় সেপাই শাস্ত্রী হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড করেনি ?

আরো গণ্ডা দুই কারণ আছে যে-গুলো দফে দফে বলার কি প্রয়োজন ? ধুন্দুমারের সময় আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের অবাধ আগমন, প্রাক্তন রাজা জহীরের গুপ্তচর প্রেরণ, কু-জনিত ইনফ্লেশনে টু পাইস কামাবার তরে বিস্তর চিড়িয়ার গমনাগমন, দাউদের রুদ্রদৃষ্টিতে বিপন্ন (প্রধানতঃ জহীরের) আত্ম-জনের যেটুকু সোনাদানা আছে সেটুকু সস্তায় ক্রয়করণ, বিশেষ করে জাল পাসপর্টের সাহায্যে পাকিস্তানী চরদের অহরহ শুভাগমন, আরো কত না বহুবিচিত্র রবাহূত জনগণ—অস্বাভাবিক অবস্থায় এঁদের সবাইকে মেকি সিকিটার মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে হয়, ডবল জালের ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ইস-পার উস-পার করতে হয়। এ কর্ম নিদ্রালু এক গণ্ডা কেরানী দিয়ে হয় না। বাংলা কথা !

বাচ্চাই সাকাও ছিল ডাকু। তদুপরি তার আমলে কাবুলের ভিতরে বাইরে কোনো এ্যার সার্ভিস ছিল না। তথাপি সে ফরেন অফিসের গুটিকয়েক জাঁদরেল কর্মচারীকে এ্যারপর্টে মোতায়েন করেছিল। মার্কিন রিপর্টার কাবুল-বাজারে দু'চারটি নাতিবৃদ্ধ মুরুব্বীকে শুধালেই তো জানতে পেতেন, ব্যাপারটা রত্তিভর নূতনত্ব ধরে না—তাই বলছিলুম, হাইকোর্টটা যে কোন্ মোকামে অবস্থিত সে খবরটাও সায়েব যোগাড় করেন নি।

শেষ প্রশ্ন, এই ভোজবাজির লীলাখেলা ক'দিনের তরে ? পাঠক, আইয়ুবী-জঙ্গী চৌকিদারী এ দেশে কতদিন চলেছিল সে বাবদে তুমি স্পেশালিস্ট, আমি স্কুলবয়। টমিগান হাতে থাকলে ঘুষ খাওয়ার সনাতন সিসটেমে ঢোকার পন্থা সহজতর, প্রলোভন খরতর। আখেরে মায় আপিসার, বেবাক সেপাইকে ছাউনিতে ডেকে নিতে হয়—করাপশন আগাপাস্তলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে। আইয়ুবের গদিতে যখন ইয়াহিয়া আসন নিলেন তখন "ফিল্ড-মার্শালের" প্রতি অনুরক্ত কোনো সেপাই-আপিসার উল্টো কু করলো না কেন ? উত্তরটি প্রাঞ্জল। সব্বাই করাপট। করাপট-জনের কোনো নেমক-হালালী থাকে না, কারো প্রতি।

কু যত নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হোক, ভোজ্যদ্রব্যের দাম বাড়বেই। মার্কিন সংবাদ-দাতা সুসমাচার জানিয়েছেন, দাউদ মোটা মুনাফাখোরদের গুলি খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে চালের দাম নাকি অর্ধেক কমে গিয়েছে। মার্কিন সুদ্দুমাত্র চালের কথাটা তোলায় বুঝতে পারলুম তাঁর পেটে এলেম কতখানি। কাবুলের সাধারণজন ভাত খায় না। ওটা অতিশয় বিরল বিলাস বস্তু। একশ' মাইল দূরের জলালাবাদ অঞ্চল, দু'শ মাইল দূরের পাকিস্তান থেকে বিস্তর পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে তণ্ডুলকে পৌঁছতে হয় কাবুলে। পাকিস্তানী চাল কালোবাজার মারফৎ। সাদায় ক'শ' গুণ ট্যাকসো, জানিনে। কাবুলের পয়সাওলা লোকও নিত্যি নিত্যি পোলাও খায় না। বুনেদী ফার্সীতে প্রবাদ, "প্রতিদিন ঈদ নয় যে হালুয়া খাবে—হর রোজ ঈদ নীস্ত কে হালওয়া ব-খুরীদ"। কাবুলে হালুয়ার পরিবর্তে পোলাও বলে।

কথিত আছে, বাচ্চাই সাকাও রাজবাড়ীতে পয়লা খানার সময় দেখে, সমুখে আমান উল্লার প্রাসাদ-পাচক প্রস্তুত জাফরানের ভুরুভুরে খুশবাইদার পোলাও। সে নাকি লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বলেছিল, "ঐ খেয়েই তো আমান উল্লা বিলকুল বুজ-দিল (ছাগলের কলিজাওলা ভীরু) হয়ে যায়, আর রাজধানী ছেড়ে পালায় কান্দাহার।" সে নাকি রুটি, কিসমিস আর দু'চিলতে পনীর—তার মামুলী খাবারই খেয়েছিল।

মার্কিন সাংবাদিকের অত্যুজ্জ্বল রিপর্ট তথা কিসমিসের স্মরণে আমার হৃদয়ে সাংবাদিক হয়ে ফোকটে দু'পয়সা কামাবার প্রলোভন জলজ্বল চিতার মত প্রজ্বলিত হয়েছে—তদুপরি পাওনাদারের ভয়ে বাড়ী থেকে বেরনো বন্ধ। ভাগ্যিস, আকছারই বিজলি মারে ফেল; তখন অন্ধকারের সঙ্গে আমার খুদা-দাদ ঘোরতর কৃষ্ণ চর্মবর্ণটি অক্লেশে মিশিয়ে দিয়ে মীরপুর রোডের মোড়ে এক ইয়ারের অন্দরে দু'ছিলিম তামুক খেয়ে কলিজাভা ঠাণ্ডা করে আসি।

ভাবছি, কালই বহির্বিশ্বে টেলিগ্রাম ঝাড়বো :

"ঢাকায় কিসমিসের সের আশি টাকায় উঠেছিল। সমাজসেবীদের ভীতি প্রদর্শনহেতু কাল চড়াকসে চল্লিশে নেমেছে।"

লুফে নেবে, স্যর, সব্বাই লুফে নেবে।

বাবুর-নামা অবহেলা বিপজ্জনক

বাবুর বাদশার নাম স্মরণে এলেই আমার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়। একাধিক মিত্র অবশ্যই বলবেন, কটা লোকের আদৌ এই বিরল গুণটি থাকে যে সে তোমার কিংবা এবং তোমার মত আর পাঁচটা চুকুম-বুদাইয়ের মস্তিষ্কে ঘন ঘন আনাগোনা করবে? অথচ ইংরেজিতে এই কাণ্ডজ্ঞান সমাসটির অনুবাদ কমন-সেন্স, এবং স্বয়ং ইংরেজই স্বীকার করে যে নামকরণের সময় ব্যাকরণে ভুল হয়ে গিয়েছে। কমনসেন্স সর্বদেশে সর্বকালে বড্ডই আন্‌কমন। বরঞ্চ এটাকে আন-কমন-সেন্স বা রেয়ার-সেন্স বলাই প্রশস্ততর—যিনি কিনা গুণীজনের চৈতন্যলোকেও নিতান্তই ওয়ান্স ইন এ ব্লু মুন, বাংলায় বলি রাঙ্গা শুকুরবারে অবতীর্ণ হন! অর্থাৎ, অতিশয় কালেকস্মিনে, নিতান্তই জীবনের বিরলতম শুভ মুহূর্তে। যেমন ধরুন এ-বাড়ির, পাশের বাড়ির, হয়তো বা আপনার বাড়ির টেলিফোনটি। এনার বেলাতেই বোঝা যায়, ইনি মহাপুরুষ। অসাধারণ অর্থাৎ আন-কমন সেন্স দ্বারা যন্ত্রটি টইটুম্বুর। সাতিশয় কালেভদ্রে আপনি এঁকে জাগ্রত অবস্থায় পাবেন। দুষ্টলোকে কয়, আমাদের রাজকর্মচারীরা এ বাবদে অলিম্পিক। আমি তীব্রকণ্ঠে, মৌলামুরশিদের দোহাই দিয়ে, যদি পাঠক হিন্দু হন তবে গঙ্গাজলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় তামা-তুলসী স্পর্শ করে, ক্যাথলিক হলে তিনবার দেহের উত্তমার্ধে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, বৌদ্ধ হলে উচ্চকণ্ঠে ত্রিশরণ মন্ত্রের শরণ নিয়ে. জৈন হলে—থাক্, ঐ তো সেকুলার স্টেটের চিরন্তনী শিরঃপীড়া, সব্বাইকে আপন আপন অতিশয় ন্যায্য হিস্‌সে দিতে হয়, এস্তেক বেতার-প্রতিষ্ঠানেও শপথ নিয়ে বলছি, এটা অতিশয় অন্যায়। অলিম্পিকের কুল্লে গোল্ড-মেডেল পাবার গগনচুম্বী পাতালস্পর্শী কুম্ভকর্ণবিজয়ী হক্ক ধরেন আমার টেলিফোনটি। অবিচল, অবিরল, নিশ্চল, সুবিমল এর কাল-কালান্তর-ব্যাপী নিদ্রাটি। সুবিমল বলার সুযুক্তিঃ এনার নিদ্রাতে কোনো মল নেই। যথা

> শুধু বেঘোরে ঘুম ঘোরে
> গরজে নাক বড় জোরে,
> বাঘের ডাক মানে পরাভব।
> আঁধারে মিশে গেছে আর সব॥

(রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কাব্য থেকে উদ্ধৃত)

আমার টেলিফোনটি নাসিকাগর্জনের মত ইতরজনসুলভ কুকর্মদ্বারা ধ্যান

ধারণায় নিযুক্ত প্রতিবেশীকে অযথা অত্যাচার করেন না। করলেই তো তাঁর সর্বনাশ। তদ্দণ্ডেই তাঁর কান দিয়ে

অনেক কথা বলে নেব
এবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ অন্ধকারে
ছিল কত গোপন গানে॥

অর্থাৎ তখন তাঁকে ফের কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে।

টেলিফোন সম্বন্ধে এতখানি বলার প্রয়োজন হল এই কারণে যে, গত রবিবার ১১-৮ তারিখে আমি লিখেছিলুম আমাদের হাইকোর্টটিকে কলকাতার-টির চেয়ে উচ্চতররূপে নির্মাণ করার জন্য আমি হেথাকার "কর্তা-ব্যক্তিদের পই পই করে অনুরোধ করি—অবশ্য ফোন মেরামতীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি পর্বতপ্রমাণ যা করতে হয় তার তুলনায় ধূলিপরিমাণ নস্যবৎ"। ইয়াল্লা ছাপাতে বেরুলো, "কোন মেরামতীর নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে নিত্যি নিত্যি ইত্যাদি অর্থাৎ "ফোন স্থলে" 'কোন' ছাপা হয়ে গিয়েছে। পূর্বে কিংবা পরে ফোনের কোনো ইঙ্গিত ছিল না বলে পাঠকের পক্ষে আগাগোড়া বাক্যটাই অবোধ্য রয়ে গেল। কিংবা পাঠক ভাবলো, আমি একটা বুদ্দু, কি একটা বাজে রসিকতা করেছি যার মাথামুণ্ডু কোনো অর্থ হয় না—রস তো দূরের কথা। কিন্তু এর সঙ্গে তড়িঘড়ি একটা সত্য এস্থলে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। টেলিফোন বিভাগ সরকার চালান। যদি বা সাহস সঞ্চয় করে টেলিফোনের প্রতি বক্রোক্তি করবো বলে মনস্থির করেছিলুম, সরকার বাবদে আমার সতত সশঙ্কিত অবচেতন মন—যার জন্ম ইংরেজের গোলামীর যুগে—আমার কলমের কানটি আচ্ছাসে মলে দিয়ে শাসিয়েছে, "অমন কম্মটি করতে যাস নি। ফোন না লিখে ল্যাখ কোন।" এবং কলমও তাই লিখেছে, ছাপাখানাও তাই ছাপিয়েছে। এর সঙ্গে এটাও বলা উচিত মনে করি, ছাপাখানা যতই ভুল করুক, সে আমাদের মত কাঁচা লেখকের কত যে বানান সংশোধন করে দেয় সে তত্ত্ব কি কেউ জানে? নেশনাল প্রফেসর সুনীতি চাটুয্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। একদা অর্বাচীন এক সাহিত্যিক আমাদের সম্মুখে ছাপাখানার বিস্তর কুৎসা গেয়ে চলে যাওয়ার পর বাঘা বৈয়াকরণিক সুনীতি চট্টো বললেন, "হুঁঃ, ছাপাখানা যে আমাদের কত না বানান-ভুল শুধরে দিয়ে সমাজে ইজ্জত বাঁচায়, তার খবর এ-চ্যাংড়া জানবে কোত্থেকে?" আমি ঘন ঘন সম্মতি তথা কৃতজ্ঞতাসূচক মাথা নাড়িয়েছিলুম।

টেলিফোনের বেলাও তাই। ঐ বিভাগের কর্মচারীরা ভদ্র এবং ডাক্তারের সঙ্গে এঁদের অনেকটা মিল আছে। ডাক্তার কি কখনো রোগীকে বলে, "দাদা, যা গোরস্তান মার্কা নিউমোনিয়াটি ঝড়-বিষ্টিতে যোগাড় করে এনেছ, এতে নিদেন তিন হপ্তার ধাক্কা!" ফোন-অফিসার কি করে বলেন, "ঝড়বৃষ্টিতে ফোনের তারটির যা হাল হয়েছে, সে তো, দাদা নতুন তারের দাওয়াই না-আসা পর্যন্ত সারবার কথা নয়—সে তো দেড় মাসের ধাক্কা।" নিউমোনিয়া সারতে এক মাস লাগলেও কি আপনি ডাক্তারকে তাড়া লাগান? তবে? ফোনের বেলাই যত গোস্‌সা!

আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা মস্ত সুবিধা রয়েছে। ফোন মারফত আমার বেশুমার পাওনাদার আমাকে বেলা-অবেলায় আর হুনো দিতে পারে না। ঐ তো মানুষ মাত্রেরই দোষ। ভালো দিকটা দেখে না; দেখে শুধু খারাপ দিকটা।

হঠাৎ মনে পড়লো, কাবুলের দূর-আলাপনী প্রতিষ্ঠানটির চেহারাটা। সে-কেচ্ছা আরেকদিন হবে।

আহাম্মুকী

বিষয়টি গুরুতর। সমস্যাটি জটিল। আমার বিদ্যে অত্যল্প।

বাবুর বাদশা তাঁর ইয়ার আমীরদের মুদ্রাস্ফীতি বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, "তোমরা কাঁড়া কাঁড়া দিনারমোহর নিয়ে কাবুল পৌছনমাত্রই তো কাবুলের উৎপাদনক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মারবে না। বাজারে আগে যে-রকম হাজারটা আণ্ডা উঠতো সেই হাজারটাই উঠবে। মাঝখানে শুধু তোমাদের দরাদরির আড়া-আড়িতে এক পয়সার মাল এক টাকা দিয়ে কিনবে।"

ঠিক ঐ পরিস্থিতিটিই গড়ে তুলেছিলেন ইংরেজ কোম্পানির জাঁদরেলরা, বাবুরের মৃত্যুর তিনশ' বছর পর, আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে। জঙ্গীলাট কীন কান্দাহার গজনী জয় করার পর বিপুল গৌরবে প্রবেশ করলেন কাবুলে এবং তাঁদের হাতের পুতুল শাহ শুজাকে তখতে বসিয়ে লেগে গেলেন বিপুলতর পরাক্রমে নববিজিত রাষ্ট্র আফগানিস্থানের উপর রাজত্ব করতে।

একে তো পুতুল রাজা মাত্রই আফগানের দু'চোখের বিষ, তদুপরি শুজা ইন্দ্রিয়পরায়ণ—জনসাধারণ করলে অসহযোগ। অর্থাৎ খুব একটা স্বেচ্ছায়

সেই সত্তের-আঠারো হাজার, কাবুলে মোতায়েন, ইংরেজ সেনাদলকে খাবার-দাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কাবুল উপত্যকার লোক এবং নিকটবর্তী জনপদবাসী বেচতে চায় না। ওদিকে গোরার পাল চায়, "প্রতিদিন হালুয়া খেতে"। জিনিসপত্রের দাম চড়চড় করে চড়বার পূর্বেই "সদাশয়" ভারতস্থ ইংরেজ সরকার ইনফ্লেশন-ইন্ধনের জন্য সৈন্য এবং অফিসারদের বিলাস-ব্যসনের তরে পাঠাতে লাগলেন বে-হিসেব বে-শুমার বস্তা বস্তা মোহর, টাকা কড়ি। এমনিতেই, স্বাভাবিক অবস্থাতেই সতেরো-আঠারো হাজার ফালতো, তায় শ্বেতহস্তীকে পোষবার মত গম-যব ফসল, ভেড়া মুর্গী কাবুল উপত্যকা ও সেই দূর হিন্দুকুশ এলাকা পর্যন্ত জনপদ উৎপাদন করে না। মুদ্রাস্ফীতি ছাড়াই, অর্থনীতির সনাতন আইনেই দ্রব্যাভাববশতঃ বাজারে লাগত আগুন। ইতি-মধ্যে আসছে, দিনের পর দিন হিন্দুস্থানের ভাণ্ডার উজাড় করে, সেখানকার তীব্র প্রতিবাদ, করুণ আর্তনাদ উপেক্ষা করে টাকার ঘি কাবুলের ইনফ্লেশন আগুনে ঢালবার তরে। গোরাদের ছাউনি শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। শহরগামী গ্রামবাসী আণ্ডাওলা মুর্গীওলাকে গোরা সেপাইরা করে চোটপাট এবং লুটপাট। ফলে সাপ্লাই গেল আরো কমে—যোগানদার সুদূর গ্রাম থেকে বেরুতেই রাজী হয় না।

গোরা মার্কা আজব ইনফ্লেশন

কাবুল শহরের কাছে ইনফ্লেশন হুমা জাতীয় আজব চিড়িয়া নয়। মাহমুদ, তৈমুর, নাদির বিস্তর লোক, বিস্তর না হোক, অল্প-বিস্তর ইনফ্লেশন ঘটিয়েছেন কাবুলে, লুটের টাকা ঢেলে। কিন্তু এবারের ইনফ্লেশনে মার খেল কাবুলের ফকির আমীর দুই পক্ষই। সে যা দাম সে দাম দিয়ে রুটি, আণ্ডা মটন আঙ্গুর, নাসপাতি, আপেল খেতে পারেন স্রেফ গোরা রায়রাই। ২৫ মার্চের পর টিক্কা গুষ্ঠীরও নিত্যিনিত্যি ছিল হালুয়া। আমীর মোল্লা গেরস্ত সবাই গেল একসঙ্গে ক্ষেপে।

ওদিকে ভারতের রাজকোষে মারাত্মক অর্থাভাব। রব ওঠেছে, সরকার মহলেই, "খর্চা কমাও, কড়ি বাঁচাও।" তখন এই পাগলা-অভিযান, ইটারনেল পিকনিকের খর্চা না কমিয়ে ইংরেজ করল আরেক গোমূর্খামী। মাসোহারা ঘুষ দিয়ে যে সব আফগান সর্দার-আমীরদের এতদিন কোনো গতিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল গণবিক্ষোভের আবর্ত থেকে, তাদের ভাত্তা দিল কমিয়ে আর সঙ্গে

সঙ্গে তারা আর তাদের পুষ্যির পাল গেল ক্ষেপে। কোথায় না একদিকে গোরাদের বে-এক্তেয়ার খর্চা কমিয়ে, অন্যদিকে সর্দারদের ভাত্তা বাড়িয়ে এবং তাদের মাধ্যমে গেরস্তদের হাতে টাকার একাংশ পৌঁছিয়ে বাজারদরে ভারসাম্য আনা হবে, তা না, উল্টে দাঁড়ি-পাল্লার যে দিকটা হাল্কা হয়ে হয়ে হিন্দুকুশের চূড়ো ছুঁই ছুঁই করছিল তার থেকে আচমকা থাবা মেরে সরিয়ে নেওয়া হল তিন থাবলা। ভারি দিকটা এক ঝটকায় ঠাং করে ঠেকলো কাবুলের পাথরে।

জাহান্নমের পথে

উন্মত্ত জনতা তিনজন ইংরেজ অফিসারকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে খুন করলো কাবুলের রাজপথোপরি—চীৎকারে চীৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে।

এর পরের কাহিনী সবাই জানেন। অশেষ লাঞ্ছনা অবমাননার পর প্রায় সাড়ে ষোল হাজার গোরা, নেটিভ—নেটিভ যৎসামান্যেরও কম—কাবুল থেকে বেরুলো ভারতের পথে। সেই ভয়াবহ জগ্‌দলক্‌ গিরিপথ, যেটাকে বাবুর পর্যন্ত সমঝে চলতেন, তারই ভিতর কচুকাটা হল শেষ লোকটি পর্যন্ত—না, মাত্র একজন ডাক্তার যখন কোনো গতিকে ছন্নের মত টলতে টলতে জলালাবাদের ইংরেজ ছাউনিতে পৌঁছল তখন সে অর্ধোন্মাদ। এটা আমাকে আর নতুন করে বলতে হবে না, এমন কি আমি স্বয়ং, মোটর ভেঙে যাওয়ার দরুন, জগ্‌দলকে যে-এক রাত্রি কাটাই সে কাহিনী উপস্থিত মুলতবী থাক।

সর্বজনীন সর্বদেশের প্রশ্নমালা

কাবুল শহরে আজও যদি অকস্মাৎ এক গাদা টাকা ফেলা হয় তবে ফল কি হবে? আফগানিস্থানে চিরকালই খাদ্যাভাব। বহির্বিশ্ব থেকে যে গম ডাল আসবে—মার্কিন রিপর্টারের শৌখীন চাল মাথায় থাকুন—সেটা আসবে কোন দেশ থেকে, কোন পথ বেয়ে, সেই হঠাৎ-পাওয়া টাকার জোরে? (সে কড়ি কাবুলে ছেড়ে ইনফ্লেশন ডাকার কোনো অর্থ হয় না)। যে দুটো পথ দিয়ে প্রধান শহর কাবুল, গজনা, কান্দাহার, জলালাবাদ বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত, সেগুলোর উপর দিয়ে একদা চলাচল করতো উট গাধা ইত্যাদি ভারবাহী পশু।

এখনো বেশীর ভাগ তাই। তবে হ্যাঁ, এখন ট্রাকও চলে। এস্থলে বলে রাখা ভালো, ট্রাকের ইসকুরু বল্টু থেকে আরম্ভ করে পেট্রলের শেষ ফোঁটা পর্যন্ত কিনতে হয় বিদেশ থেকে। এবং দুটি রাস্তার একটা জগ্দলক জলালাবাদ হয়ে পৌঁছয় পাকিস্তানের পেশাওয়ারে, অন্যটিও পাকিস্তানের চমন-কুয়েটাতে।

পাকিস্তানের খুব একটা ফালতো গম ডাল আছে বলে শুনি নি। তদুপরি দুই দেশে খুব একটা দিল-জানের দোস্তী আছে এ কথা আরো কম শুনেছি। তবু পাকিস্তান হঠাৎ খামোখা দাউদ খানকে ভারতে কেনা বা মার্কিনদত্ত গম তার দেশের ভিতর দিয়ে পাস করতে দেবে না, এটা চট করে বিশ্বাস করা যায় না। পাকিস্তান খুব-একটা টাকার কুমীর তালেবর মুল্লুক নয়। মধ্যবর্তী ব্যক্তি হামেশাই দু'পয়সা কামায়।

কিন্তু প্রশ্ন, আজ, যদি দাউদ খান রুশের সঙ্গে বড্ড বেশী ঢলাঢলি আরম্ভ করেন এবং মার্কিন চটে যায়, ফলে মার্কিন-পাকিস্তান ইরান এক জোট হয়ে পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমের পথ সীল করে দেয় তবে শুধুমাত্র উত্তরের পথ দিয়ে রুশ তাবৎ আফগানকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কি, চাইবে কি? আমার জানা নেই, পাঠক বলতে পারবেন, এযাবত রুশ ক'টা দেশকে খানা-দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

তাই আফগানিস্থানকে আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে প্রশ্ন, না হয় মেনে নিলুম জহীর' আর তাঁর ইয়ার-বখশীরা ছিলেন করাপ্ট্। কিন্তু আমান উল্লা? লোকটা তো তখ্ৎ হারালো প্রগতিশীল ছিল বলে। হবীব উল্লা ছিলেন অলস, কিন্তু তিনিও কি চেষ্টা দেন নি দেশটাকে সচ্ছল করার? তাঁর পূর্বের বাঘা বাঘা আবদুর রহমান, দোস্ত মুহম্মদ? এঁদের বলবুদ্ধির তারিফ বিস্তর বিচক্ষণ বিদেশী করেছেন। এঁদের মূলধন ছিল না? দাউদ খান যদি পান, তবে পাবেন, একা রুশের কাছ থেকে। হবীব, রহমান, দোস্ত পেতেন দু'পক্ষ থেকেই। সে সোনা-দানা তো তাঁরা চিবিয়ে খান নি। সে সে সব গেল কোথায়? যদি বলেন, আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা অনেক কিছু করা যায়, তবে শুধোই, ভারত যে ছাব্বিশ বছর ধরে কুল্লে টেকনিক্যাল কল এস্তেমাল করলো তার ফলে জনগণের দরিদ্রতা ঘুচলো কতখানি? তবু তো ভারত অনেক কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ ধরে, উৎপাদন করে। নেই নেই করে বাংলাদেশেরও গরীবানা-মুরৎ দু'একটা খুদাদাদ দৌলত আছে, শিক্ষিত লোক আছেন, "নো-হাউ" গুণী আছেন। আমরাই কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুখ-স্বপ্ন

দেখায় খুব একটা সাহস পাই ? আমি হাড়ে-মিষ্টি অপটিমিস্ট—আমার কথা বাদ দিন।

আফগানিস্থানের আছেটা কি ?

হাজার বছর পূর্বে একজন চৌকশ বাদশা আটঘাট বেঁধে আফগানিস্থানকে আপন পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে'ছিলেন। তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

*

* *

সাধারণজনের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের দৈনন্দিন ব্যবহার দুনিয়াটাকে ন্যাজ-মুড়ো বদলে দিয়েছে। টেলিগ্রাফ, বেতার, বিজ্ঞান-বদৌলত নিত্যি নিত্যি নয়া নয়া দাওয়াই ইন্‌জেকশন, খুদায় মালুম আরো কত কি ! কিন্তু বিজ্ঞান যে আমাদের এই বাংলাদেশের কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করেছে মানুষ সেদিকে নজর ফেলে না। এবং সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি বলে মনে হয়, এই মুখ-পোড়া বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের সে সর্বনাশের অগ্রগতি ঠেকাতে হবে। এ ব্যাপারটা শুধু যে আমাদের বেলাই প্রযোজ্য তা নয়, কি আফগানিস্থান, কি ইরান এমনকি পূর্ব ইউরোপের একাধিক অনুন্নত দেশও বিজ্ঞানের প্রকৃতির স্বরূপটা সঠিক ধরে উঠতে পারছে না। সবাই ভাবছে, একবার কোনো গতিকে গাদা গাদা টাকা পেয়ে গেলে তাই দিয়ে কিনে নেব লেটেস্ট মডেলের যন্ত্রপাতি, তৈরী করবো হুদো হুদো মাল—ইংলণ্ড, জর্মনি, আমেরিকা যে রকম করেছে আর সম্বৎসরে দুধে-ভাতে থাকে,—আমাদের বেলাও হবে তাই।

এই বাংলাদেশের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন, এ-দেশ বহু শতাব্দী ধরে অসাধারণ বিত্তশালী ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভূপর্যটক ইবন-বতুতা বাংলাদেশ দেখার পর বলেছিলেন, এত সস্তায় (এত বিচিত্র) জিনিস তিনি আর কোথাও দেখেন নি। চীনের মত বিশাল ধনবান রাষ্ট্র, নানা রকমের দ্রব্য নির্মাণে সিদ্ধহস্ত বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীতে অন্য কোনো রাষ্ট্র ছিল না। সেই চীন দেশের লোক বহু শত বৎসর ধরে বাংলাদেশে নিত্য-নিয়ত এসেছে নিপুণ হস্তে নির্মিত বহু বিচিত্র পণ্যসম্ভারের জন্য। সেসব বস্তুর ফিরিস্তি, এ দেশের সমৃদ্ধি সাচ্ছল্যের বিবরণ চীনা ভাষা থেকে অনুবাদিত হয়ে এ দেশে যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের মত অজ্ঞ লোক বিশ্বাসই করতে পারি নি, এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত প্রয়োজনীয় তথা বিলাস বস্তু এই দেশেরই লোক একদা নির্মাণ করেছে। কিন্তু সে-দিনের ঐশ্বর্য নিয়ে আলোচনা আজ আমার বিষয়বস্তু নয়। আমার উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন দরিদ্রদেশ

কি প্রকারে একদা ধনবান হয় এবং আবার সেই দরিদ্রতায় ফিরে যায়। পাঠক যদি বাংলাদেশের কথা মনে রেখে তাদের সঙ্গে সে-দেশ মিলিয়ে তুলনা করে নেন, তবেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। বহু দেশের বহুবিচিত্র উত্থান-পতনের বহুরূপী ঘটনা, তাদের ধনোপার্জন শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ইত্যাদির প্রত্যেকটি অঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে এ দেশের একই প্রচেষ্টা, সাফল্যলাভ, অধঃপতন তুলনা করতে গেলে এ রচনার নির্ধারিত তনু বে-সামাল কলেবরে পরিবর্তিত হবে। রহমান রক্ষতু!

অসামান্য মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি এস্থলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একাধিক গুণীজন দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, ইংরেজ আগমনের প্রাক্কাল পর্যন্ত এ দেশ দরিদ্র ছিল না। মাত্র শতকরা ষাটজন লোক চাষবাস করতো, শতকরা চল্লিশজন শিল্পদ্রব্য নির্মাণে নিযুক্ত থাকতো। ইংরেজ যেমন যেমন কলে তৈরী সস্তা মাল এ দেশে ছাড়তে আরম্ভ করলো—নানা কৌশলে দেশের ধনদৌলত লুণ্ঠন করে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে আনার কর্মটা অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বেড়েই চলছিল—তেমন তেমন এ দেশের কুটির-শিল্প লোপ পেতে লাগলো। শিল্পীদের ধনোপার্জনের পন্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের সামনে রইল শুধু চাষের কাজ। পূর্বে যে জমি এ দেশের ষাটজনকে কাজ যোগাত, ক্রমে ক্রমে সেটা নব্বুই-পঁচানব্বুইয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। জমি সে-ভার, তদুপরি জনসংখ্যা-বৃদ্ধির চাপ সইতে পারবে কেন? দেশের দারিদ্র্য চরমে গিয়ে পৌঁছল।

রাজার এক্সপেরিমেণ্ট এক্সপেরিমেণ্টের রাজা

গজনীর মাহমুদ বাদশা উত্তমরূপেই লক্ষ্য করেছিলেন ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা, শিল্পনৈপুণ্য, শিল্পদ্রব্য-বৈচিত্র্য এবং প্রাচুর্য। এসব রফতানী করে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত হয়েছিল ভারতের অতুল ধনসম্পদ। কথিত আছে, সর্বসুদ্ধ অষ্টাদশবার তিনি ভারতলক্ষ্মী-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। এই অষ্টাদশ অভিযানের চেয়ে অল্প লোমহর্ষক একটি মাত্র সংগ্রাম নিয়ে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত লেখা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে শূন্য শ্মশান, মাহমুদের প্রতি অভিযানান্তে গজনীতে বৃহত্তর স্বর্ণোদ্যান! পাঠান্তরে সপ্তদশ অভিযানের উল্লেখ আছে। এ পাঠও গ্রহণযোগ্য। মহাভারতের মুষলপর্ব মূল মহাকাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর, সে তত্ত্ব অনস্বীকার্য। অতএব সপ্তদশ পর্বে সম্পন্ন মহাভারত অনাসৃষ্টি নয়।

সর্ব ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ একমত যে, মাহমুদের লুণ্ঠনের ফলে এ দেশের ধনদৌলত সর্বনাশা রক্তক্ষরণের মত বেরিয়ে গিয়ে (এপোলিং ড্রেন অব ওয়েলথ) সম্পূর্ণ দেশটাকে হীনবল অসাড় করে দিয়েছিল। এই লুণ্ঠনের খতিয়ান, দফে দফে বয়ান দিয়ে এর পরিমাণ ও মূল্য নিরূপণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। একমাত্র নাগরকোট-এর মত দ্বিতীয় বা ইণ্টার ক্লাস নগরিকা থেকে তিনি পান, সাতলক্ষ সোনার মোহর, সাতশ' মণ সোনা এবং রূপার পাত, দু'মণ খাঁটি সোনার তাল, দু'হাজার মণ খাঁটি রূপার তাল এবং কুড়ি মণ হীরে, পান্না, মুক্তো ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ-ইনভেনট্রিতে হস্তীঅশ্ব কামধেনু, অস্ত্রশস্ত্র, বহুবিধ ধাতু, বিচিত্র কারুকার্যময় পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠদ্রব্যাদি—শতাধিক আইটেম ধরা হয় নি। একটা অভিযানে, মাত্র একটা নগরিকা থেকে যদি এতখানি সম্পদ লুণ্ঠিত হতে পারে তবে সপ্তদশ অষ্টাদশ অভিযানে অগণ্য নগরে কতখানি পাওয়া যায় তার কল্পনাও অসম্ভব। মাত্র এই 'পরশুদিন' ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিত্রপক্ষ ইয়োরোপে কি পরিমাণ, কত বিচিত্র বস্তু, মায় গণ্ডায় গণ্ডায় সমূচা কারখানা আপন আপন দেশে বাজেয়াপ্ত-জাহাজে করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তারই কি লেখাজোখা হয় ?

বস্তুত মাহমুদ কি পরিমাণ সম্পদ স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন সেইটেই এস্থলে প্রধান বক্তব্য নয়। কত রাজা কত লুটই না করছেন, সে-সব নিয়ে আলোচনা বৃথা। এই 'শান্তি'-কালেই যা-লুট পৃথিবীর সর্বত্র "ন্যায়ত ধর্মত" মায় ওয়াটার গেট হচ্ছে তারই খবর রাখে ক'জন ? এবং সব চেয়ে সর্বনেশে লুণ্ঠন—দেশের ভিতর যখন "রাজার হস্ত, করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি !"

আমার বক্তব্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বটে কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির।

এক বাক্যে সর্বজন স্বীকার করেছেন, সুলতান মাহমুদ ছিলেন অসাধারণ গুণগ্রাহী, সর্বমুখী-গুণসম্পন্ন বিদগ্ধ পুরুষ। কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞানের গুণীজনকে তিনি এমনই অকাতরে অর্থসম্পদ দান করতেন যে দেশ-দেশান্তর থেকে প্রতিভাবান অসংখ্য গুণীজ্ঞানী তত্ত্ববিদ সেই শুষ্ক কঠিন সৌন্দর্যহীন, প্রাকৃতিক সর্বসম্পদে নিরঙ্কুশ বিবর্জিত গজনী শহরে জমায়েত হয়েছেন, সমস্ত জীবন সেখানে কাটিয়েছেন। আজ থেকে বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে রাজা মাহমুদের সভাকবি ফিরদৌসী, সভাপণ্ডিত অল-বীরুনীর সহস্র বার্ষিকী প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিদ্বজ্জন সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেছেন। অল বীরুনী সংস্কৃত জানতেন। ভারতের অপর্যাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও তিনি বা অন্য কোনো সভাপণ্ডিত অর্থনীতি নিয়ে বাদশার সঙ্গে

আলাপ-আলোচনা করেন নি, এটা অবিশ্বাস্য।

তদুপরি মাহমুদ তো মাত্র একবার ভারতবর্ষ লুট করে সে-ধন গজনীতে ছড়িয়ে দিয়ে তার কুফল সুফল দেখেন নি। অধিকাংশ লুণ্ঠনকারীরা মাহমুদের মত, পরবর্তীকালে বাবুরের মত পর্যবেক্ষণশীল ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানকর্মে নিয়োজিত করার মত জ্ঞানী ছিলেন না; তদুপরি তারা বার বার পুনর্বার লুণ্ঠন করার মত সুযোগ-কুযোগ পান নি যে আপন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু দু'একবার লুঠ করার পর সুলতান মাহমুদ নিশ্চয়ই অর্থ কি, ব্যবসাবাণিজ্যে অর্থের গুরুত্ব কি, অর্থের সফল ও নিষ্ফল প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকখানি গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, এই আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস।

লুট করা ধনদৌলত সুদ্দুমাত্র সঞ্চয় করা বা নিছক উড়িয়ে দেওয়াই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি প্রতিবারে প্রধানতঃ বন্দী করে অথবা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে সর্বপ্রকারের আর্টিজান, ছুতোর, তাঁতী, স্থপতি, প্রস্তর কর্তনকারী, স্বর্ণকার, তাম্রকার, বস্তুত হেন শিল্প নেই যার দক্ষ হুনুরী—পালে পালে তিনি সুদূর গজনীতে নিয়ে যান নি। অতি অবশ্যই তিনি প্রতিমা-নির্মাণকারীদের সন্ধানে কস্মিনকালেও বেরোন নি, ঐ যা এক মাত্র ব্যত্যয়। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। কোথায় সে শীতল মলয় আর শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনী মাতা? সেই নির্জলা নিষ্ফলা, সেই পোড়ারমুখো দেশটাকে তিনি চেয়েছিলেন ফলপ্রসূ করতে, কিন্তু কী সে দেশ! তবে কি না, আমি কোন দেশ সম্বন্ধে কি বলি না বলি, কোন দেশের কি বয়ান দিই না দিই, তারই উপর যদি সুচতুর জন আস্থা রাখতেন তবে তো আমি এ্যাদ্দিনে বিলেত, নিদেন কাবুলের ফরেন মিনিস্টার হয়ে যেতুম! তা হলে শুনুন, সর্বশাস্ত্রবিচারদক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে শার্লক হোমস মসুদরানা যাঁর কাছে নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত 'আবুদিয়া', সেই বাবুর বাদশা গজনী সম্বন্ধে কি বলেছেন,—অনুবাদ প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁর।

গজনীর স্বরূপ

"গজনী একটা দরিদ্র নগণ্য স্থান। আমি ভেবে হামেশাই তাজ্জব বোধ করেছি যে, হিন্দুস্তান খুরাসানের যাঁরা অধীশ্বর ছিলেন তাঁরা খুরাসানকে বাদ দিয়ে এমন একটা নগণ্য স্থানকে কি করে রাজধানী করেছিলেন।…গজনী ছোট দেশ। এখানে কৃষিকাজ অতি কঠিন। যে-জমি এক বছর আবাদ হয়,

পর বছর সে জমি ফের ভাঙতে হয়।" অথচ বাবুরই বলছেন, গজনী অঞ্চলে পানির অভাব নেই। তদুপরি মাহমুদ এখানে কৃষির জন্য তিনটে বাঁধ তৈরী করেছিলেন। "তার একটার উচ্চতা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ!" বাবুর যখন গজনী যান তখন তার একটি বাঁধ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, অন্যটি মেরামতির জন্য বাবুর কিছু টাকা পাঠিয়ে বলছেন, "আমি আশা করি আল্লার রহমে বাঁধটি নিশ্চয়ই আবার নির্মিত হবে।" তৃতীয়টি তখনও কার্যক্ষম। তাবৎ গজনী জেলা ঘুরে বাবুর বলবার মত যা পেলেন সে "গজনীর আঙুর কাবুলের আঙুরের চেয়েও ভালো, এখানে তরমুজের উৎপাদনও অনেক বেশী, আপেলও খুব ভাল।" এবং আরো তাজ্জব লাগার কথা যে "গজনীর প্রধান চাষ লাল রং উৎপাদক এক প্রকার লতা। এটি বেশ লাভজনক কৃষি। এ লতা প্রচুর পরিমাণে হিন্দুস্থানে চালান হয়।"

একাই এক লক্ষ

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতই পড়ি ততই সন্দেহ দৃঢ়তর হয়, যে ক'টি দ্রব্য বাবুরের আমলেও গজনীতে উত্তম, সেগুলো কারো না কারো চেষ্টার ফলে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে তোলা হয়েছে। আমার পক্ষে প্রমাণ করা কঠিন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, মাহমুদ ভালো করেই বুঝেছিলেন, বিদেশ থেকে যত সোনা এনেই গজনীতে ছড়াও না কেন, বিদেশীরা সেই টাকার লোভে যতই উৎকৃষ্ট বিলাসব্যসনের জিনিস এমন কি খাদ্যদ্রব্যাদিও গজনীতে এনে বিক্রি করুক না কেন, লুটের টাকাও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে—যদি না কৃষি এবং শিল্পজাত দ্রব্য দেশ উৎপাদন করতে পারে। এই যে লতার কথা বাবুর বলছেন, এর থেকেও সন্দেহ হয়, মাহমুদ রফতানীর জন্য এটার চাষ প্রবর্তন করিয়েছিলেন। হুনুরী এনেছিলেন সর্বপ্রকারের—পোড়ার দেশের লোক যদি কোনো একটা শিল্প শিখে নিতে পারে! কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি ঘি ঢালছিলেন ভস্মে। ভারতের অর্বাচীন ঐতিহাসিকরা বলেন, মাহমুদের স্বর্ণতৃষা ছিল অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, প্রতি প্রচেষ্টাতে নিষ্ফল হয়ে, লোকটা আবার বেরুতো নয়া ক্যাপিটালের সন্ধানে। আমরা যে রকম এক-একটা ফাইভ-ইয়ার প্লেন শেষে নিরাশ হয়ে ফের বেরুই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে। এ কথা সত্য, গজনী শহরটাকে মাহমুদের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর ঘোর-অধিপতিরা পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করেছিলেন। কিন্তু এ রকম কত শহর কতবার লুট করে পুড়িয়ে ফেলা

হয়েছে—কোনো প্রকারের উৎপাদন ক্ষমতা থাকলে সে-নগর ফের পুনর্জন্ম লাভ করে। গজনী এক ধাক্কাতেই খতম।

হিন্দুস্থানের বিরাট স্বর্ণভাণ্ডার বার বার লুট করে, সে দেশটাকে প্রায় ফতুর করে দিয়ে, কুল্লে দৌলত পাঁড় দেশপ্রেমী একগুঁয়ে সুলতান মাহমুদ অকাতরে ঢাললেন ঐটুকু এক চিলতে গজনী অঞ্চলে। আজকের দিনে একশ জর্মন বা রুশ "নো-হাউ" শ্বেতহস্তীকে পুষতে গেলে আমাদের বেল্টখানা তিন ফুটো টাইট করতে হয়! মাহমুদ এনেছিলেন হাজার হাজার "নো-হাউ" হুরী জলের দরে। পুরো-পাক্কা প্ল্যানিংয়ের জন্য তাঁর সভায় বিজ্ঞজনের অভাব ছিল না।

সেই দোস্ত মুহম্মদের আমল থেকে আজকের প্রেসিডেন্ট দাউদ। অপরিবর্তনীয়তে কি এমন পরিবর্তন ঘটলো, কি এমন সোনাদানা জুটলো—তাও ধারকর্জায়—যে "রিপাবলিক্" নামক নয়া নাম দিতেই কুল্লে আফগান মুল্লুকে মধু-দুগ্ধের ছররাপ লেগে গেল?

তা হলে আর ভাবনা কি? কাল থেকে ঢাকার নাম পালটে বলবো লণ্ডন, "পূর্বদেশের" নাম পালটে বলবো, "দি টাইমস", আর, হে পাঠক, তোমারও আয়ের অঙ্ক হুশ করে উঠে যাবে লণ্ডনবাসীর কাঁধ মিলিয়ে। ঘরে ঘরে টি-ভি, গারাজে গারাজে মোটর। বছরে দেড় মাস ছুটি মন্টিকার্লোতে!!

সাধারণ আচরণ

কাবুল থেকে ১৮ই আগস্ট প্রেরিত, কলকাতায় ১৯ আগস্ট প্রকাশিত খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা গাউস বখস বিজেনজো এবং আতা উল্লা খান মেংগলের গ্রেফতারীতে আফগান সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ফলে আফগান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাবুলে অবস্থিত পাক রাষ্ট্রদূতকে এত্তেলা পাঠিয়েছেন এবং গ্রেফতারীর বয়ান দিতে বলেছেন।

ধরে নেওয়া যেতে পারে, আফগান পররাষ্ট্র বিভাগ শুধু যে জনসাধারণকে তাঁদের প্রাগুক্ত উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন তাই নয়, পাক রাষ্ট্রদূতকে সর্বপ্রথম এই চিত্তবৈকল্যের দুঃসংবাদ জানিয়েই তাঁকে "অভ্যর্থনা" জানাবেন। কাগজে বেরিয়েছে "ডেকে পাঠান" অতএব হয়তো অভ্যর্থনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

শুনেছি, এদেশে নাকি ইংরেজ আমলে হোম মিনিস্টার বা স্টেট সেক্রেটারী

ফাঁসীর আসামীর করুণাভিক্ষার আবেদন না-মঞ্জুর করলেও পত্রশেষে পাদনামায় লিখতেন, "মহাশয় আপনার একান্ত বশীভূত ভৃত্য হওয়ার গৌরব প্রাপ্ত" অমুক—"আই হ্যাভ দি অনার টু বী, স্তার, ইওর মোস্ট অবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট" লেখার পর নাম সই করতেন। প্রকৃত সত্য নিরূপণার্থে দু'চারজন ইয়ার-বখশীকে এই সাতিশয় সিভিল প্রশ্নটি শুধোলে তাঁরা রীতিমত মিলিটারি হাঁক ছেড়ে গাঁক গাঁক করে যে-সব অশ্রাব্য উত্তর দিলেন তার থেকে অনুমান করলুম, তাঁদের প্রতি কখনো সরকার এমন অনুগ্রহ করেন নি যে, জনৈক সবৈতনিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারী স্বহস্তে সসম্মানে একটি প্রয়োজনাতীত সুদীর্ঘ নেক-টাই তাঁদের গলায় পরিয়ে, পায়ের নিচের টুলটি এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে, কবিবরের ভাষায় "দোদুল দোলায়" দোদুল্যমান করবে। তথাপি আমার মনে ধোঁকা রয়ে গেল, সদাশয় সরকার এবম্প্রকার দুর্লভ গৌরব দেখালে তাঁরা মহারাণীর জন্মদিনে প্রদত্ত খেতাবের মত সে নেকটাই গ্রীবাদেশে পরিধান করতেন কি, না। আমার প্রশ্ন, আদব-কায়দার প্রটোকল সংক্রান্ত।

সচরাচর কাবুলে এগানা-বেগানা কেউ এলেই উচ্চকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানানো হয়, "আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক—ব-ফরমাইদ, তশরীফ আনয়ন করুন—তশরীফ বিয়ারিদ, আপনার কদম মবারক হোক—কদম তান মবারক, আপনার চশম রৌশন হোক—চশমে তান রওশন।" সম্পূর্ণ পাঠটি বেহদ দরাজ পত্রিকায় গুনজাইশ নেহায়েত তঙ্গ। আমি মজবুর হয়ে মখ্তসরে কাবুলের সিভিল প্রটোকলটি সেরে নিলুম।

কিন্তু এস্থলে কার্যকরী হবে, ডিপ্লোমিটিক অর্থাৎ কূটনৈতিক কিংবা, রাজদূত সমাগম-সুলভ রাজসিক প্রটোকল। সে প্রটোকল বহুরূপী। যেমন ধরুন একটি সুপরিচিত নজীর: বার্লিনস্থ ফরাসী রাজদূত কুলোঁদ্র পূর্বাহ্নে এত্তেলা দিয়ে গিয়েছেন জর্মন ফরেন অফিসে—জর্মন পররাষ্ট্র মন্ত্রী য়োখিম ফন রিবেণ্ট্রপকে স্বহস্তে একটি মহামূল্যবান রাজপত্র সমর্পণ করতে। রিবেণ্ট্রপ কেন, ফরেন অফিসের নগণ্য ফুট-ফরমাইশের ছ্যামড়াভা তক জানে সে দলিলটি কি।

বিঘোষক দৌবারিক দ্বার উন্মোচন করে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিবে, "হিজ এক-সেলেনসি সম্মানিত ফরাসী রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ অধিকারাধার (প্লেনিপোটেন-শিয়ারি) রাষ্ট্রদূত সর্বোচ্চ সম্মানাধিপতি মসিয়ো কুলোঁদ্র!" গৃহমধ্যে উচ্চাসনে বসে আছেন এক দিকে ফন রিবেনট্রপ। সম্মুখে বী-টীম ফুটবল খেলার মত বৃহৎ টেবিল। অন্যদিকে অভ্যাগতের জন্য একখানা নাতি-

উচ্চাসন। কুলোঁত্র অন্যদিনের মত ফরাসী ভাষায় বুঁজুর বা জর্মনে গুটন টাখ বলবেন না। যে-চেয়ারে বসার কথা, সেটাকে উপেক্ষা করে ঋজু কঠিন মেরুদণ্ড টান টান করে খাড়া দাঁড়িয়ে সূক্ষ্মমাত্র গ্রীবাটি ক্ষণতরে পোয়াটাক ইঞ্চি নিচু করে বাও করবেন। রিবেনট্রপও উঠে দাঁড়িয়ে সম-মেকদারে বাও করবেন, মেহমানকে অন্যদিনের মত আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাবেন না বা হ্যাণ্ডশেকের জন্য হাত বাড়াবেন না। বলা বাহুল্য, দুজনারই মুখমণ্ডল দেখে মনে হবে দুজনারই দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য।

আমি একটি প্রকৃত ঘটনারই বিবরণ দিচ্ছি। এটা ঘটেছিল ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। তার আগে আরেকটা ঘটনার উল্লেখ করে নিই। আজ ২২ আগস্ট। চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে ঠিক গতকাল আমাদের প্রাগুক্ত রিবেনট্রপ গিয়েছিলেন মস্কো। সেখানে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল এমনই সম্মান, যেটা রাজার রাজার কপালেও কালেকস্মিনে লেখা থাকে। রিবেনট্রপ তাঁর প্রভু হিটলারের হয়ে স্তালিনের সঙ্গে বিশ্বসংসারের অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় এক মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করার পর স্তালিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "প গালে, প গালে—গেলাশ গেলাশ।" সঙ্গে সঙ্গে জনা ছয় কমরেড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সমবেত কমরেডদের জন্য সেই জার-আমলের ফেনসি গেলাস, আর ইহলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্যামপেন। ফটাফট বোতলের কর্ক লম্ফ মেরে ঠোকর দেয় ছাতে। শ্যামপেন বইতে লাগল যেন, জাহ্নবী-যমুনা, বিগলিত করুণা, নাহি তার তুলনা। স্তালিন মদ খেতে পারতেন জালা জালা। আর-সব কমরেড টেবিলের তলায় বেহেড মাতাল হয়ে অচৈতন্যি হওয়ার পরও স্তালিন একা একা চালিয়ে যেতে পারতেন আরেক পাল শুষ্ক-কণ্ঠ নয়া কমরেড না আসা পর্যন্ত। তাদের অবস্থাও হতো তদ্বৎ। হিটলার ছিলেন নিরামিষ-ভোজী, মদ্যে বিরাগ। অথচ তাঁর দোস্ত ছিলেন পাঁড় পীনেওলা, ফোটোগ্রাফার হফমান। তাঁকে রিবেনট্রপের সঙ্গে পাঠিয়েছেন, মৈত্রী-পরবের ছবি তুলতে, আর স্তালিনের সঙ্গে সুধাপানে পাল্লা দিতে। হফমানই সে জলসার রসময়—উভয়ার্থে—সরেস বর্ণনা দিয়েছেন, হিটলার গত হওয়ার পর তাঁর কেতাবে "হিটলার ছিলেন আমার দোস্ত"। এটা হল সৌজন্যের প্রটোকল সুধাপান ম্যাচ ও সেই প্রটোকল অনুযায়ী ড্র যায়।

সে সন্ধ্যায় হিটলার তাঁর সাঙ্গপাঙ্গসহ জর্মনিতে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আকাশে "উত্তরের আলো" দেখছিলেন। নৈসর্গিক এই সূর্যরশ্মি মাঝে মাঝে দেখা যায়। হিটলারের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মন্ত্রী স্পের (যুদ্ধ চালনার অপরাধে

কুড়ি বৎসর জেল খেটে বেরবার পর) তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ "স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে লিখেছেন, সমস্ত আকাশ টকটকে লালে লাল হয়ে গিয়েছে, আমাদের হাত মুখ যেন সে লালের ছোপে লাল হয়ে গিয়েছে। লালের সেই লীলা-খেলায় আমাদের মন যেন অদ্ভুত এক চিন্তায় নিমজ্জিত। হঠাৎ হিটলার তাঁর অন্যতম মিলিটারি এ্যাডজুটেন্টের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন "গাদা গাদা রক্তের মত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এবারে বিনা রক্তপাতে আমরা সফল হব না।"

আমার এক বোন এবং সিলেটের আরো কে জন বলছিলেন, তাঁরা ১৯১১-এর ২৫ মার্চে রক্তে রাঙা অস্বাভাবিক টকটকে লাল সূর্যাস্ত দেখেছিলেন। এঁদের দুজনাই অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ, সর্ব কুসংস্কারবর্জিত। তবু নাকি তাঁদের মনে এক অজানা অস্বস্তি অনেকক্ষণ ধরে জেগে রয়েছিল।

হিটলারি হেকমত

যাক সে-কথা। খুব একটা দূরে চলে আসি নি। আর সামনেই ৩রা সেপ্টেম্বর। কুলোঁদ্রে রিবেনট্রপ দুজনাই যেন আজন্ম মূক বধির—এতক্ষণ অবধি। অতঃপর কুলোঁদ্রে প্রতিটি শব্দ যেন হরফ গুনে গুনে পড়ে গেলেন জর্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ-ঘোষণা। ঘোষণান্তে এস্থলে রিবেনট্রপ ত্রিবিধ পন্থার যে কোনো একটা বেছে নিতে পারেন। নীরবে ঘোষণাপত্র গ্রহণ করতে পারেন, কিংবা বলতে পারেন তিনি এ ঘোষণা আন্তর্জাতিক বিধিবিধান বিরোধী বে-আইনীরূপে গণ্য করে ঘোষণাটা রিজেক্ট করছেন, কিংবা ঘোষণা সম্বন্ধে আপন মন্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। রিবেনট্রপ কষায় বদনে, প্রকৃতিদত্ত তাঁর বেতমীজ কণ্ঠে অতি দীর্ঘ এক বিবৃতি পড়ে যেতে লাগলেন—অবশ্য দুই পালোয়ানই তখনো ঝাণ্ডার ডাণ্ডার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, নড়ন চড়ন-নট-কিচ্ছু—দফে দফে বয়ান করলেন ফ্রান্সের অগুণতি অপরাধ, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নীরন্ধ্র নিরবচ্ছিন্ন গুণাগার হারামী একমাত্র ফ্রান্সই, জর্মান গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতাটি। সর্বশেষে কণ্ঠস্বর এক পর্দা চড়িয়ে বললেন, যুদ্ধ যদি লাগে তবে ফ্রান্সই সর্বাংশে দায়ী।

মসিয়ো কুলোঁদ্রে স্থিরদৃষ্টিতে রিবেনট্রপের দিকে তাকিয়ে দুটি মাত্র শব্দ বললেন, "লিস্তোয়ার জ্যুজরা"—"বিচারিবে ইতিহাস"। বৃথা বাক্য। ইতিহাসই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ বিচারক।

প্রথম দর্শনের মাথা নিচু করে বাও করা থেকে মাথা পরিমাণ কমিয়ে

পুনরায় বাওয়া করার আভাসটুকু ছুঁইয়ে কুর্নোত্র ধীর পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। ব্যস। ইরানী জবানে বলে, "অতঃপর আলোচনার গালিচাখানি গুটিয়ে গুটিয়ে রোল করে বোন্দা পাকিয়ে ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হল।"

এ-ধরনের ঘোষণার শেষে প্রথম পাঠেই, উভয় দেশের ইলচির স্বদেশ প্রত্যাগমন ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে দু-একটি নিতান্তই প্রতি পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ফরমূলা থাকে। আমার টায়-টায় মনে নেই। এ দুনিয়ার নাতিহ্রস্ব জিন্দেগীর চন্দ রোজের মুসাফিরীতে এ-তাবৎ "তোকে আমি দেখে নেবো" চারটি মাত্র শব্দ বলে কাউকে নিরস্ত্র কথাকাটাকাটির নির্জলা ঘোঝাযুঝিতেও দাওয়াত জানাতে এ ভীরু আদার ব্যাপারী ধারকর্জ করেও হিম্মৎটুকু যোগাড় করতে পারে নি—সে রাখবে মানওয়ারী জাহাজের খবর!

কাবুলী কায়দা

বেলুচিস্তানে কয়েকজন হোমরাচোমরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তা তাঁরা যতই গেরেমভারী হন না কেন, তাই নিয়ে আফগানিস্তান হিটলারি হেকমতে ভুল কালাম কাণ্ড করবে অর্থাৎ সেটাকে আন্তর্জাতিক আইনে যাকে বলে 'কাজুস বেল্লি'—'ওয়ার কজ', 'যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যথেষ্ট কারণ' এ কথা বলবে না। অবশ্য আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে খুন জখমের মত মারাত্মক ব্যাপারের মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে প্রায়ই শেষটায় দেখি, অতি তুচ্ছ "কারণে" বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। বড় বড় যুদ্ধের পিছনে আকছারই দেখা গেছে, যে কারণে আখেরে লড়াই শুরু হয় সেটা কোনো কারণই নয় ইতিহাস বার বার সে সাক্ষ্য দেয়। উপস্থিত আফগান পক্ষ কি ভাবে তাঁদের বক্তব্য, আপত্তি, প্রতিবাদ, শাসানো যেটাই হোক পেশ করবেন বা চোখ রাঙ্গাবেন তার উপর আখেরী নতীজা অনেকখানি নির্ভর করছে। আমরা তাই একাধিক কাল্পনিক ছবি আঁকতে পারি মাত্র :

আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বয়ং সরদার দাউদ বা তাঁর প্রতিনিধি : বেলুচিস্তানে এ-সব কি হচ্ছে?

মিঃ ভুট্টোর নির্দেশ অনুযায়ী পাক রাষ্ট্রদূত (যদি মোলায়েম হওয়ার নির্দেশ থাকে) "হেঁ হেঁ হেঁ! কিছু না, কিচ্ছুটি না।" (যদি গরম নির্দেশ থাকে) "তোমার তাতে কি ভেটকি-লোচন?"

আফগান পক্ষ : "বটে! আমার তাতে কি? এ-সব জুলুম চলবে না। দেশ শান্ত করো।"

পাক পক্ষ : "ওটা আমার ঘরোয়া ব্যাপার।" এই ঘরোয়া-ব্যাপারের জিগির গেয়ে গেয়ে পাকিস্তানের গলায় কড়া পড়ে গেছে।

আ প : "নিতান্তই আন্তর্জাতিক, দ্বি-রাষ্ট্রীয় ব্যাপার এটা। দেশের লোককে বেধড়ক ঠ্যাঙাবে, তারা শুধু বেলুচ নয়, পাঠানও বিস্তর, তারা সীমান্ত পেরিয়ে আমার দেশে ঝামেলা লাগাচ্ছে, এদেশের পাঠানকে তোমার দেশের পাঠান দিবারাত্তির তাতাচ্ছে, তোমার সঙ্গে লড়াই দিতে।"

পা প : "তোমার দেশ তুমি সামলাও।"

আ প : "ইণ্ডিয়ার ঘাড়ে একবার লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী চাপিয়ে যে আক্কেল-সেলামীটা দিলে তার পরও তোমার হুঁশ হল না?"

পা প : "কেন, খারাপটা কি হল? ইয়াহিয়া গেছে, বেশ হয়েছে। আমরা 'নরুন দিয়ে হাঁড়ি পেলুম তাক ডুমাডুম ডুম।' আমরা ইয়েহিয়া দিয়ে ভুট্টো পেলুম, তাক ডুমাডুম ডুম। জ্ঞানে লুকমান, বিচারে সুলেমান, বুদ্ধিতে—"

আ প (বাধা দিয়ে) "সুলেমান শব্দের সঙ্গে মিল একটা বিশেষ জনের আছে, কিন্তু—"

পা প : (বাধা না মেনে)

"সুধা পানে এক্সিদ শা।
জঙ্গী লড়ায়ে কামাল পাশা॥
ফলসফাতে আফলাতুন—"

অকস্মাৎ দৌবারিকের প্রবেশ। হন্তদন্ত হয়ে বললে, "বাঙ্গালা দেশ, না কি যেন নাম, সেখান থেকে কিছু লোক সোঁদরী, না কি যেন লকড়ি, না লাঠি—নিয়ে এসেছে।"

আ প : "কি তাজ্জব! পাকিস্তানের লোকটা গেল কোথায়?

ঘরে বাইরে, জেলে বাইরে

বিংশ শতাব্দীর যে-একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্তন দেশের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একদা চিন্তিত করে তোলে এবং আজ যেটা নিতান্ত বুড়ো-হাবড়া ছাড়া আর-সবাই অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়, সেটা ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে। আজ যদি ঢাকাতে কোনো একটা ঘটনা

সর্বসাধারণের মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং পর দিন তারই ফলে দেখা যায়, আপিস-আদালত-দোকানপাট বন্ধ, বেতার কথা কয় না, কাগজওয়ালা কাগজ দেয় নি আর রাস্তায় রাস্তায় বিরাট বিরাট মিছিল কুল্লে শহরটাকে গিলে ফেললে, শুধু—শুধু কোনো মিছিলে একটি মাত্র ছাত্র—সরি—ছাত্রীছাত্র নেই, তবে আপনার-আমার মন কি ধরনের ঝাঁকুনি, বরঞ্চ বলা উচিত, কি ধরনের বিজলির শক্ খাবে সেটা কল্পনা করতে পারেন কি? কারণ শুধিয়ে যদি শুনতে পান, ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়িতে হোস্টেলে দোরে খিল দিয়ে পাঠ্যবই পড়ছে এবং বলছে, প্রশাসনে যোগ দিলে লেখা-পড়া করবো কখন? তোমরা মিছিল করে গণতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, জুন্তাতন্ত্র, যে ঢপের গবরনমেণ্টই কায়েম করো না কেন, দু'দিন বাদে সেটা চালাবার জন্য আমরাই তো হব মন্ত্রী, সেক্রেটারী, পার্লামেণ্টের মেম্বার, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনীয়ার। এখন যদি রাজনীতি, অর্থনীতি, এড্‌মিনিসট্রেশন, গয়রহ্ ভালো করে না শিখি, তবে সরকারের রূপটা পাল্টে কিই বা এমন পাকা ধান ঘরে তুলবে তোমরা?"

সত্যিই তো। ৪৭-এ যখন ভারত সরকার তৈরী হল, তখন দেখা গেল যেসব আত্মোৎসর্গকারী নেতারা মন্ত্রী হলেন, যাঁরা পার্লামেণ্টের মেম্বার হলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই কলেজজীবন থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত কাটিয়েছেন জেলে জেলে। মাঝে-মিশেলে আম-কাঁঠালের ছুটিটা-আসটা পেয়েছেন বটে, কিংবা অতীব অকারণে, হঠাৎ করে গাঁধী বড়লাটে একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়ার বরকতে এবং ঐ সুবাদে জেলগুলোর চুনকাম-মেরামতী, তদুপরি জেল-সাম্রাজ্যের ইনসপেক্টর জেনারেল গোরা রায়দের বহুদিনের প্রাপ্য "হোম" যাওয়ার মুলতুবী ফার্লো ছুটি যখন আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এহেন ত্র্যহস্পর্শ উপলক্ষে তাঁদেরও কিছুদিনের তরে নেটিভ হোম দেখার জন্য মহামান্য সম্রাটের রাজসিক অতিথিশালা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে—এ-সত্যটাও অস্বীকার করা যায় না। ততোধিক অস্বীকার করা যায় না, কেউ বেরিয়েছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কেউ ডিগ্রিহীন জ্বর-যক্ষা নিয়ে, কেউ বা স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে বাড়ি এসেছেন, যাতে করে তাঁর হাড্ডিগুলো বাপ-পিতেমোর হাড্ডির সঙ্গে সম্মিলিত হয়: সরকারী ইংরিজিতে বলা হয় যাতে করে "হিজ বোনস আর গ্যাদার্ড আনটু হিজ ফোর-ফাদার্স," অথবা একই শ্মশানে পিতৃপুরুষের ভস্মের সঙ্গে তাঁর ভস্ম মিলিত হবে বলে।

সুস্থই হোন আর নিম-মরাই হোন, ঐ চন্দরোজের ফুরসতে তাঁরা যে মার্শাল মার্কস কেইনস লাসকি পড়ে বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে যাবেন কিংবা

দেশের বাজেট কিভাবে চৌকশ ব্যালানস করে বানাতে হয়, অথবা নামকে-ওয়াস্তে যে সব এসেমব্লির তখনো সেসন হচ্ছে, সেগুলো নিত্যদিন এটেণ্ড করে তর্কাতর্কি, নন-কনফিডেনসের ঘোল খাওয়ানোর কায়দা-কেতা রপ্ত করে নেবেন এমনতরো দুরাশা করা যায় না।

আমার পাপ মন থেকে কেমন যেন একটা বেয়াদব সন্দেহ কিছুতেই দূর হতে চায় না, মহাত্মা গান্ধী তাই বোধ হয়, স্বরাজ লাভের পর সভয়ে পার্লামেণ্টের ছায়াটি পর্যন্ত মাড়ান নি। হিন্দু মহাসভার হামলাতে কুপোকাৎ হয়ে যেতেন না তিনি? আপনারা বলবেন, "ক্যান? বারিসভরিডা তেনার পাস করা আছিল না?" হুঃ! খুব আছিল! কলকাতা পার্কে বিলিতি কাপড় পোড়ানোর জন্য যখন একদিন আসামী হয়ে দাঁড়ালেন, ততদিনে বেবাক ব্যারিস্টারি বিদ্যে কর্পূর হয়ে উপে গিয়েছে—হাওয়ার হাওয়ায়! সঠিক মনে নেই, কাকে উকিল পাকড়ে ছিলেন। আমাদের চাটগাঁয়ের সেনগুপ্তকে? তিনি তখন জেলে না বাইরে, তাও ভুলে গিয়েছি। বাইরে থাকলে তাঁকেই ধরা উচিত ছিল। তাই বলছিলুম, আইনের এলেম যদি তাঁর পেটে এক দানাও থাকতো তবে কি তিনি নিদেন একটা ডেপুটি মিনিস্টারও হতে পারতেন না! পক্ষান্তরে স্মরণে আসুন, গাঁধী যে রকম পার্লিমেণ্টের মুখ দর্শন করেন নি, লেট ব্যারিস্টার জিন্নাও হুবহু তেমনি জেলের মুখ দর্শন করেন নি। তিনি কাইদ-ই আজম, সদর-ই-পাকিস্তান হবেন না, তো হবে কে? গাঁধী?

এই জেলের কথা যখন নিতান্ত উঠলোই তখন রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়লো। তিনি তো কোনো প্রকারের দেশ-সেবা করেন নি, কোনো প্রকারের "বাণী" রেখে যান নি, তাই বলছি। রবীন্দ্রনাথ যখনই খবর পেতেন তাঁর কোনো প্রাক্তন ছাত্র, কোনো ছাত্র বা শিক্ষকের আত্মীয় ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জেল থেকে বেরিয়েছে বা তার কোনো পরিচিত রুগ্ন যুবার পিছনে পুলিশ বড্ডবেশী তাড়া লাগাচ্ছে, সে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে, তখন তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলতেন, "এখানে থাক। শরীরটা সারিয়ে নে। লাইব্রেরি রয়েছে। পড়াশোনা কর।" যদি তাঁর মনে হতো, পুলিশ নাছোড় বন্দা, তাহলে টেগার্টকে জানিয়ে দিতেন, "আমার এখানে অমুক এসেছে, রুগ্ন শরীর সারাতে। আমি কথা দিচ্ছি, সে যতদিন এখানে আছে, এ্যাকটিভ পলিটিকস করবে না।" কেন জানিনে, টেগার্ট কবির কথা শুনতেন এবং আরেকটি ঘটনার কথা আমি ভালো করে জানি। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এক যুবা, এ-দেশে কম্যুনিজমের উদয়-কালে সে-মতবাদের অত্যুৎসাহী সমর্থক ও প্রচারক হয়ে যায়। টেগার্ট

যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁকে ধরতে চান নি। কবিকে জানান, "অমুককে বলুন না, সে মস্কো চলে যাক। কম্যুনিজম স্বচক্ষে দেখে আসুক। আমি তাকে পাসপোর্ট দেব।" হয়তো টেগার্ট ভেবেছিলেন, দূর থেকে অনেক জিনিসই সুন্দর দেখায়, কবি বায়রণের ভাষায়,—

"সে যেন জীর্ণ প্রাসাদ ঘেরিয়া
শ্যামা লতিকার শোভা,
নিকটে ধূসর জর্জর অতি
দূর হতে মনোলোভা।"

যুবার সঙ্গে আমার বার্লিনে দেখা হয়। টেগার্টের আশা আধাআধি সফল হয়েছিল। ভদ্রলোক তখন স্টালিনের নাম শুনলে ক্ষেপে যেতেন। মস্কো থেকে সদ্য ফিরে এসেছেন। তাঁর মতবাদ হয় স্টালিনের পছন্দ হয় নি কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাঁকে রাশা ছেড়ে বার্লিন চলে আসতে হয়। কিন্তু মার্কসিজমে দৃঢ়তর বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে তিনি কম্যুনিজমের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন।

পলিটিক্‌স্‌-হীন ছাত্রসমাজ ?

কল্পনাও করা যায় না, কি গুমোট গরমে এই ঢাকায়, কি কাবুলের মোলায়েম ঠাণ্ডায়—আজকের দিনে।

গুন গুন করছি,

রজনী নিদ্রাহীন
দীর্ঘদগ্ধ দিন,
আরাম নাহি যে জানে।
ভয় নাহি ভয় নাহি,
গগনে রয়েছি চাহি
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

রাত দুটো বাজতে চললো। আল্লা মেহেরবান। ঝঞ্ঝা থাক মাথায়। ঝঞ্ঝার গুরু সাইক্লোনের কৃপায় এ-দেশটা যায়-যায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। বুড়ীগঙ্গা ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ রাইফেলসের বিরাট মাঠ পেরিয়ে, চাঁদমারি টিলাটার বেণুবনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু হায়, কোথায় সে বেণুবন—দেড় বছর আগেও যা ছিল? টিলাটার নিচ দিয়ে বারো মাস বয়ে যায় ক্ষীণ জলধারা, কচুরিপানা ঠেলে ঠেলে এগোয়, ছোট্ট নালা বেয়ে সাত-মসজিদ-রাস্তার দিকে। আর বর্ষায় তার কি দাপট! এই এখন মৃদু পবনে আকাশ-ছোঁয়া বাঁশ দুলে দুলে এ-ওর গায়ে পড়ে মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী শোনাতো, কানে কানে, কত গোপন গানে গানে। আর বর্ষার আকাশ-বাতাসের দাপটের সময় দেখেছি, অরণ্য হতাশ প্রাণে, আকাশে ললাট হানে—শহীদের মাতারা যেন আকাশে মাথা কুটছে, বিরাম না মেনে চলছে তাদের ক্রন্দন!

সে বেণুবন দেড় বছরে আজ প্রায় নিঃশেষ। যে পারে, যার ইচ্ছে কেটে নিয়ে গেল প্রথম দীর্ঘাঙ্গীদের। এখন কচি বাঁশগুলো যখন কাটে, তখন আমি দু'কানে আঙুল গুঁজে দাঁতে দাঁত কাটি। হাউসমানের কবিতায় পড়েছিলুম, হতভাগার ফাঁসী হবে পরের দিন ভোরে। নিরেট অন্ধকারে চোখ মেলে সমস্ত রাত ধরে শুনছে, খট খট শব্দ। বাইরে ফাঁসীকাঠ তৈরী করছে মিস্ত্রিরা—তারই পেরেক ঠোকার খট খট আওয়াজ রাতভর। ঐ কাঠেই সে ঝুলবে; ঘাড়ে দড়ি বেঁধে দেবে ফাঁসুড়ে। হাউসমান কবিতা শেষ করেছেন এই বলে,

যে-ঘাড় খুদাতালা তৈরী করেছিলেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে··· মট করে মটকাবার জন্য না।

শেষ বাঁশ কাটা হয়ে গেলে আমিও শান্তি পাবো। কিন্তু মরবে আরেক জন।

যে-টিলাটার উপর চাঁদমারির পাঁচিল, সেটা নালার সম্বৎসর বয়ে যাওয়া পানিতে, বিশেষ করে বর্ষার প্রবল আঘাতে যেন ক্ষয়ে গিয়ে ধস নেমে পাঁচিলটা হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে না পড়ে, তাই টিলাটার সানুদেশ, নালার কিনারা অবধি সমস্তটা ছেয়ে বাঁশ লাগিয়েছিলেন সেই দূরদর্শী গুণী যিনি চাঁদমারির পুরো প্ল্যানটা তৈরী করেছিলেন—তিনি বাঙ্গালী। আমার মত মূর্খও বাঁশবনের তত্ত্বটা বুঝতে পারে। এখন অন্ধকার—কৃষ্ণা দশমী; বলতে পারবো না, আর ক'টা কচি বাচ্চা বাঁশ অবশিষ্ট আছে। দিনের আলোতে গুনতে দেড় আঙুলের বেশী লাগবে না।··· লোকে বলে, "যাক্ না কেন জোয়ার জলে। থাক্ না কেন বাঘে। কোন অভাগা জাগে।" আমার তাতে কি! ভাঙবে ব্যাটা পাঁচিলটা।

ছাত্ররা বলেন, "পেশাদারী পলিটিশিয়ান দেশের কথা যত না ভাবে, নিজের স্বার্থের কথা ভাবে ঢের ঢের বেশী (নিউগেটের পর কে অস্বীকার করবে এ তত্ত্বটা?)। আমরা এখনো সংসারে জড়িয়ে পড়ি নি। আমরা করাপট হব না, চট করে। পারলে দু'চার জন করাপট প্রফেশনালদের ঠ্যাঙ্গাতেও আমাদের বাধবে না।" কথাটার মধ্যে ও বাইরে গভীর জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস স্বপ্রকাশ। প্রাচ্যের পলিটিকসে করাপশন বেশী বলেই এ-ভূখণ্ডে প্রথম ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। কাবুল পর্যন্ত পৌঁছতে একটুখানি সময় লেগেছে। বছর দশেক পূর্বে কাবুল পার্লিমেণ্টে বোর্কাহীন, অনবগুণ্ঠিতা একজন মহিলা সদস্যা লেকচার দিতে উঠলে, প্রাচীন-পন্থী কট্টর আরেক সদস্য ছুটে গিয়ে, তাঁকে আক্রমণ ক'রে, তাঁর জামা-কাপড় ছিঁড়তে আরম্ভ করে। নিরুপায় হয়ে তিনি পার্লিমেণ্টগৃহ ত্যাগ করে প্রাণপণ ছুটে গিয়ে একটা হস্টেলে ঢোকেন।

ছাত্ররা তাঁকে আশ্রয় দেয়। খবর পেলুম এবারে তারা খোলা ময়দানে নেমেছে। তাদের ভিতর মাও, মস্কো, র‍্যাডিকাল তিন দলই আছে। ভাবছি, সিরীজের শিরোনামাটা পাল্টাবো কি না॥

*

* *

'মৃত', ইংরিজি 'মর্টেল' 'মার্ডার', ফরাসী 'মর', জর্মন 'মর্ড', ফারসী 'মুর (দন)', গ্রীক 'ব্রতস'—ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান সর্ব ভাষাতেই 'মরা' অর্থে সংস্কৃত 'মৃ'='মরা' পাওয়া যায়। বর্তমান দিনে উত্তর ভারতের সব ভাষাতেই ঐ 'মৃ' পাওয়া যায়, বাংলায় 'মরা', হিন্দীতে 'মরণা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিন্ধীতেও ঐ 'মো' দিয়েই 'মর' মানুষের সর্বশেষ ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত কর্মটি প্রকাশ করা হয়। সেই 'মো'-এর সঙ্গে 'ন' যোগ দিয়ে 'মৃত' শব্দের বহুবচন নির্মাণ করা হয়: ফলে সিন্ধীতে 'মোন' শব্দের অর্থ 'মৃতরা'। উচ্চারণ করার সময় সিন্ধীরা আমাদের মত 'মোন' বা 'মন'-এর মত করেন না। আমরা, পূর্ব বাংলায়, যে রকম মেঠাই 'মোহনভোগ' উচ্চারণ করার সময় 'মোহন' শব্দের 'হ'টি 'অ'-এ পরিণত করে 'মো'টা আরেকটু লম্বা করে দি, সিন্ধীরাও ঠিক তেমনি উচ্চারণ করেন, যেন শব্দটা 'মোঅন'। বাংলায় আমরা যে রকম 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ' বাক্যটিতে বড়লোকদের সঙ্গে তাঁদের পীরিতির সম্পর্ক বোঝাবার জন্য 'র' অক্ষর যোগ দি, কিংবা ইংরিজিতে 'ফুলস প্যারাডাইজ'—'আহাম্মুকের স্বর্গ', 'ডগস টেল'—কুকুরের ল্যাজ বাক্যে এপস-ট্রফি এবং 'এস' অক্ষর যোগ করি, হিন্দুস্তানীতে 'রহমতকা বেটা'—রহমতের ছেলে বাক্যে 'কা' জুড়ি, সিন্ধীরা তেমনি 'মৃতদের টিলা' আপন ভাষাতে লেখেন 'মোন-জো দড়ো', উচ্চারণ করেন প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে—'মোঅন (কিন্তু 'মো' আর 'অ'-এর মাঝখানে আরবীর হামজার মত সামান্য আমরা একটুখানি থেমে যাই, সেটা করা হবে না, 'মো'-র ও-কারটা শুধু দীর্ঘতর করতে হবে) জো দড়ো'।

প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার ভগ্নস্তূপ যে স্থলে আছে, তার আশপাশের আধুনিক জনগণের মধ্যে একটা বহুদিনকার কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, ঐ টিলার নিচে বিস্তর মৃতজন রয়েছে। সঠিক কিন্তু তড়িঘড়ি অনুমান করে বসবেন না, যে ঐ (লারকানা) অঞ্চলের জনপদবাসী—সিন্ধুর চার-পাঁচ হাজার বৎসরের মৃত, পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতার স্মরণে টিলা অঞ্চলের নাম দিয়েছিল মোন-জো দড়ো। বস্তুত তাদের ধারণা ছিল, একদা ওখানে প্রাচীন বৌদ্ধদের বিহার-ভূমি ছিল।

আমি লোকমুখে যা শুনেছি সে অনুযায়ী পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় যখন এই টিলাটি প্রথম দেখেন, তখন এটাকে কোনো বৌদ্ধস্তূপের

ভগ্নাবশেষ বলেই ধরে নিয়েছিলেন, কারণ হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়ে সিন্ধু দেশের রাজা যদিও হিন্দু ছিলেন, তবু সে দেশে যথেষ্ট বৌদ্ধ বিহার সঙ্ঘারাম আছে। যতদূর মনে পড়ে, রাখালদাস টিলা খোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পান বৌদ্ধ-নিদর্শন, আরো গভীরে যাওয়ার পর বেরুলো এমন সব বস্তু, যা রাখালদাসের মত সুপণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক পৃথিবীর কোনো যাদুঘরে বা তার দর্শনীয় বস্তুর ছবিতে দেখেন নি। অর্বাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক হলে হয়তো এগুলো অবহেলা করতো, এবং চিরতরে না হলেও বিশ্ব-জন হয়তো বহু শতাব্দী অপেক্ষা করার পর এ সভ্যতার সন্ধান পেত। রাখাল-দাস প্রথম দর্শনেই বুঝতে পেরেছিলেন এর অনন্যতা ও নিশ্চয়ই 'ইউরেকা' হুঙ্কার রব ছেড়েছিলেন।

গোড়াতে বহু পণ্ডিতই ধারণা করেছিলেন, সিন্ধু সভ্যতা উত্তর সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব (হারাপ্পা) অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরে দেখা গেল, সুদূর প্রসারিত ছিল এ-সভ্যতা। তা'হলে সমস্যা দাঁড়ায়, এত বড় বৃহৎ সভ্যতাকে সম্পূর্ণ নির্মূল-নিশ্চিহ্ন করাটা তো খুব একটা সম্ভাব্য সাধারণ ব্যাপার নয়। আমি কোনো সদুত্তর পাই নি, এটা না বললেও চলবে।

এ-সভ্যতা অন্তত বেলুচিস্তান অবধি যে সম্প্রসারিত ছিল সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অধুনার মোন-জো দড়ো অঞ্চলের সিন্ধীদের কোনো-কিছুতেই যে-রকম প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না (ঐ লারকানা অঞ্চলের অধিবাসী মিঃ ভুট্টো আজ সেই বিদগ্ধ অতিপ্রাচীন সভ্যতার বংশধর রূপে বড়ফাট্টাই করেন কি না, সেটা দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের রাজ-নৈতিকরা বলতে পারবেন না) ঠিক তেমনি অধুনার বেলুচদের কি চিন্তা, কি জীবনধারায় সিন্ধু সভ্যতার চিহ্নমাত্র নেই। বস্তুত (ভবিষ্যতের) পখতুনিস্তান, বর্তমান আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কমানিস্তান প্রভৃতি ভূখণ্ডে যেখানে পর পর বৌদ্ধ সভ্যতা হিন্দু-সভ্যতা, সর্বশেষে হিন্দু-বৌদ্ধ মিলিত সভ্যতা প্রচলিত ছিল সেখানে এগুলোর সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না, অর্থাৎ এদের জীবনের উপর ওরা কোনো প্রভাবই রেখে যায় নি। এমন কি ইয়োরোপের শিক্ষিত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপর হীদেন গ্রীক, রোমান এমন কি বর্বর টিউটন যে গভীর দাগ কেটে গেছে তার শতাংশের একাংশও না। পরবর্তীকালে এই বাংলাদেশে যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দেশের চাষা জেলে যতখানি ইসলাম মেনে চলে, পাঠান বেলুচ উজবেক, কিজিলবাশ (ইয়েহিয়ার কওম) তার দু'আনা পরিমাণও না। এবং আমার পক্ষে অট্টহাস্য সংবরণ করা বড়ই মুশকিল মালুম

হয়, যখন পাঞ্জাবী সেপাই, এমন কি তথাকথিত শিক্ষিত পাঞ্জাবী মুসলমান আপন ইসলাম নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করে,—ডান হাতে গেলাশ বাঁ হাত সাদরে সম-রতি-সখার কাঁধে রেখে। ব্যত্যয় অবশ্যই আছে ; উপস্থিত সে-আলোচনা থাক।

বেলুচ পাঠানদের মনোবৃত্তি বুঝতে হলে উজান গাঙে আমাদের চলে যেতে হবে হাজার বছর চারেক পূর্বে। পণ্ডিতরা বলেন, মোটামুটি ঐ সময়েই আর্যেরা ইরান হয়ে এ-দেশে আসে। এদের এক অংশ ইরানে বসতি স্থাপন করে। গোড়ার দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্য এদের প্রধান পন্থা ছিল, গবাদি পশুপালন এবং পরসম্পদ লুণ্ঠন। এবং আর্যদের দেশ-দেশান্তরে অভিযানের সময় যারা যে-অঞ্চলে রয়ে গেল তারা স্থায়ী বসবাস নির্মাণ না করে যাযাবর বৃত্তিই প্রচলিত রাখল। ..এ-স্থলে স্মরণে রাখা উচিত, যৎসামান্য কৃষিকর্ম দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। উন্নত কৃষিকর্ম শিখতে মানুষের হাজার হাজার বৎসর সময় লেগেছে।

খৃ পূ ছয়শত বৎসর পূর্বে ইরানের কিছু লোক কৃষিকর্ম ও কৃষির প্রকৃত মূল্য বুঝতে পেরে গিয়েছে। এদের নেতা ছিলেন জরথুস্ত্র (ইংরিজিতে জোরো-আস্তর—চলতি ফার্সীতে জরতুস জরথুস—জর্মন দার্শনিক নীৎশে কিন্তু জর্মন জরথুস্ত্রই লিখেছেন)। ইনি ইরানের বল্খ অঞ্চলের রাজা গুশতাসপকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন—ভারতের পার্সী সম্প্রদায় এই জরথুস্ত্রী ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু এহ বাহ্য। প্রত্যেক ধর্মের একটা নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থাকে। জরথুস্ত্র রাজা গুশতাসপকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, যাযাবরবৃত্তি লুণ্ঠন ও শুধুমাত্র গোপালন দ্বারা কোনো সমাজ চিরতরে আপন খাদ্যসমস্যা সমাধান করতে পারে না, এবং যারা প্রতি বৎসর পালিত পশুর খাদ্য ঘাস-পাতা-ভরা উর্বরা জমির সন্ধানে দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়াতে বাধ্য, অর্থাৎ যারা চিরদিনের যাযাবর, তাদের দ্বারা আপাতদৃষ্টিতেই কোনো সভ্য-সমাজ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তখন আরম্ভ হল সংগ্রাম দু দলে—যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে উন্নতমানের কৃষিকার্যে সক্ষম হয়ে স্থায়ী বসবাস নির্মাণ করে সভ্যতার গোড়া-পত্তন করতে যাচ্ছে, অর্থাৎ জরথুস্ত্র-গুশতাসপের অর্থনীতিতে বিশ্বাসী—এবং যাদের রক্তে নিত্য নিত্য স্থান পরিবর্তনের, ঘুরে ঘুরে মরার নেশা, যে নেশা পরিপূর্ণ সভ্য মানুষের শরীর থেকেও কখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় না, যে নেশার আবেশে বিদগ্ধ নাগরিক কবি গেয়ে ওঠে,

"ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন !

চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে
সকল বাধাহীন ॥"

গৃহী এবং যাযাবরে এ-দ্বন্দ্ব চির পুরাতন তথা অতি সনাতন, নিত্য পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়। কথিত আছে চেঙ্গিসের মঙ্গোলরা বিস্তর রাজ্য জয় করার পরও যখন যাযাবর বৃত্তি ছাড়তে বিমুখ, তাঁবু ছেড়ে প্রাসাদে থাকতে নারাজ তখন চেঙ্গিসের প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, "ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বসে রাজত্ব করা যায় না" (অত্যল্প ভিন্নার্থে বলা চলে "ইয়াহিয়া ট্যাংকে চড়ে বঙ্গ রাজ্য জয় করতে পারেন, কিন্তু ট্যাংকে চড়ে রাজত্ব করতে পারবেন না)।" ইয়োরোপে এখনো বিস্তর বেদে ঘুরে বেড়ায়—হিপি তাদেরই ভেজাল সয়াবীন তেল—কোনো সরকারই বিস্তর প্রলোভন দেখিয়েও ওদের কোথাও বসাতে পারেন নি।...কথিত আছে, জরথুস্ত্র যখন যাযাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত গৃহীদের জন্য পরম প্রভু আহুরমজদার পূজা করছেন (জরথুস্ত্রীরা অগ্নির উপাসনা করে না, অগ্নিকে সর্বাধিক পাক সৃষ্টিরূপে গভীর শ্রদ্ধা জানায়) তখন শত্রুপক্ষ কর্তৃক নিহত হন।

বেলুচী ভাষা ও পাঠানের পশতো ভাষা দুইই প্রাচীন জেন্দে (জরথুস্ত্রীয় ইরানী ভাষা ; ঐ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা রচিত বলে একে আবেস্তান বা আবেস্তাও বলা হয়) থেকে উৎপন্ন, বা বিবর্তিত, বলা যেতে পারে। প্রাগুক্ত সংগ্রামে বেলুচ ও পাঠান হেরে গিয়েও সম্পূর্ণ হারে নি। আড়াই হাজার বছর পরও তারা গৃহী বটে, যাযাবরও বটে। গৃহস্থরূপী পাঠান বেলুচ অতিশয় অনুর্বর জমিতে কিছুটা চাষবাস করে বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর তাদের বৃহৎ অংশ উর্বর চারণভূমির সন্ধানে জরু-গরু, ভেড়া-খচ্চর নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, চীন কোনো দেশের কোনো সীমান্তের রত্তিভর পরোয়া তারা করে না। কারো ধড়ে দুটো মুণ্ডু নেই,—দাউদ, ভুট্টো, শাহ, কারোরই—যে, ওদের কাছ থেকে পাসপোর্ট চাইবার হিম্মৎ—হেকামতী দেখাবেন। ঐ অতি পুরাতন যাযাবর বৃত্তির সঙ্গে অতি অবশ্যই তারা বহু সনাতন লুণ্ঠন-ধর্মটি ন'সিকে তোয়াজ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। বস্তুত ঐটেই তাদের প্রফেশন, চাষবাস নিতান্তই একটা নগণ্য "হবী"—স্ট্যাম্প কালেক্ট করার

মত। পাকিস্তানের শহুরে পাঠান বেলুচ অটোনমি চায় না স্বাধীন হতে চায় —অতটা খবর নেবার মত ফুরসৎ আমার নেই, অত এলেম আমার পেটেও ধরে না। কিন্তু প্রশ্ন, শহরের বাইরে যারা থাকে তারা কবে কোন রাজাকে খাজনা-ট্যাকসো দিয়েছে, শুনি। উল্টে তারা সাবসিডি পায়। খাইবার পাসের দু-পাশের পাঠানদের কারো বাচ্চা হলে প্রথম ছুট দেয় পেশাওয়ার বাগে। সেখানে নামটা "পত্রপাঠ" রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়ে তবে যায় ধীরে-সুস্থে মোল্লার বাড়িতে। তিনি ততোধিক আস্তে-ব্যস্তে একটা তোলা নাম ঠিক করে দেন—কি যেন একখানা কেতাব থেকে, যদিও সুবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, পাঠানিস্তান জানে, তিনি একবর্ণও পড়তে পারেন না, আলিফের নামে ঠ্যাঙা!

এরা আরো স্বাধীন হবে কি করে? গোল মার্বেল কি গোলতর করা যায়? স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলেন নি, লিলি ফুলটিকে রঙ মাখিয়ে আরো রঙিন করতে যায় কে?

আর যদি নিতান্তই কোনো পাঠানকে শুধোন, "হে ইয়ার! পাকিস্তান হিন্দুস্তান যদি তোমাদের নিয়ে লড়াই লাগায়, তবে তোমরা কোন পক্ষ নিয়ে লড়বে?" তবে সে-পাঠান অনেকক্ষণ ধরে তার পাগড়ির ন্যাজটা দড়ি দলার মত পাকাতে পাকাতে বলবে, "আগা জান! দুটো কুকুর যদি একটা হাড্ডি নিয়ে লড়ালড়ি লাগায়, হাড্ডিটা কি কোনো পক্ষ নিয়ে লড়ে?"

ওয়াটার গেটের পানি সিন্ধুজল

ফার্সীতে বলে, "দের আয়েদ, দুরুস্ত আয়েদ" "দেরিতে যা আসে, দুরুস্ত হয়ে আসে।" "দের"—তেহরানের ফার্সীতে "দীর"—শব্দটা, "ধীরে ধীরে" অর্থও ধরে। ওয়াটার-গেটের নোনাজল পিণ্ডিতে পৌঁছেছে ধীরে ধীরে। এমনিতেই বাংলায় বলে "দেখি না, শ্রাদ্ধের জল কদ্দুর অবধি গড়ায়"—তাতে এসে জুটলো গেট ভেঙে হুড়মুড়িয়ে ওয়াটার গেটের পানি, ওদিকে সিন্ধুতে বান জেগেছে। এক্কেবারে খাজা তেরোস্পশ্শ (ত্র্যহস্পর্শ), মাইরি! বলবে 'সামবাজারী' খাস কলকাত্তাই। সিন্ধুর এই বান বার বার সাত বার মোন-জো-দড়োকে নাকানি-চুবুনি খাওয়ালে পর ওখানকার লোক তিতিবিরক্ত হয়ে জরু-গরু নিয়ে কেটে পড়লো, কিংবা হয়তো সাত বারের বার সাত হাত পানিমেঁ ঘায়েল হল। কিন্তু এ আন্দাজটা বোধ হয় ধোপের পানিতে টেকে না।

চল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর আগে মার্শাল সাহেব যখন বিরাট ডবল ইটের থান মার্কা ঢাউস তিন-ভলুমী মোন-জো-দড়ো প্রকাশ করলেন তখন আর পাঁচজনের মত আমিও পাণ্ডিত্য ফলাবার তরে তার উপর হুদ্দমুদ্দ হয়ে আছড়ে পড়েছিলুম। মোন-জো আখেরে বানের জলে খতম হয়েছিল কি না, এ প্রশ্নটা তখন শুধোলে ভালোমন্দ, অন্তত এ-বাবদে লেটেস্ট্ থিয়োরি কি সেটা বলতে পারতুম; লেটেস্ট্ বললুম এই কারণে যে, কেতাব বেরুবার আগে পত্র-পত্রিকায় সিন্ধু সভ্যতা নিয়ে এস্তের আলোচনা বাদ-প্রতিবাদ তো হয়েই ছিল, বেরবার পর দুনিয়ার কুল্লে গুণী-জ্ঞানী তত্ত্ববিদ মাথায় গামছা বেঁধে লেগে গেলেন, হয় মার্শালকে ঘায়েল করতে, নয় তাঁকে আসমানে চড়াতে। সুচতুর পাঠককে বলে দেবার কোন দরকার নেই, দুসরা দলের বেশির ভাগই ছিলেন ইংরেজ। সে সময় আমার এক আইরিশ গুরু বলেছিলেন, সীলগুলোর উপর যে লিপি খোদাই করা আছে সেটা পড়তে না পারা পর্যন্ত চিত্তিরবিচিত্তির থিয়োরি গড়া বিলকুল বেকার—হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধার মত। এর পর বৃদ্ধ গুরু তাঁর জীবনের শেষ দশ বৎসর কাটান লিপি পাঠের নিষ্ফল প্রচেষ্টাতে। সে কাহিনী আর কোন সুবাদে না হয় বলবো। কিন্তু সিন্ধু লিপির চেয়ে ঢের রগরগে লিপি ওয়াটার-গেট মামলা নিয়ে—মিঃ নিক্সন যে টেপ-লিপি যখের ধনের মত জাবড়ে ধরে বসে আছেন। প্রকাশ পেলে সে লিপি কিন্তু অনায়াসে পড়তে পারবে, মার্কিন স্কুল বয় তক্। উহুঁ, হ'লো না। সন্দেহ-পিচেশ মার্কিন অমার্কিন দুশমনজন বলছে, পড়তে পারবে বটে, কিন্তু কত লিপি কত পাষণ্ডই না ভেজাল ঢুকিয়ে মূল লিপি পয়মাল করেছে—যাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়, প্রক্ষিপ্ত, ইণ্টারপলেশন। নিক্সনই লিপিটি নিয়ে যে ছিনি-মিনি খেলবেন না, এমনতরো সাধু মহাশয় তো তিনি নাও হতে পারেন। বস্তুত আখেরে যখন নিঃসন্দেহে ধরা পড়লো নিক্সনের সাঙ্গোপাঙ্গোর প্রায় সব কটাই ফোর টুয়েনটির ফেরেব্বাজ, তথাপি, তখনও যারা তাঁর ব্যক্তিগত সততার কেত্তন গেয়েই চলেছে তাদের উদ্দেশে এক বিদগ্ধ ঠোঁট-কাটা মার্কিন নাগরী বলেন, 'একটা ঘাপটি মারা ব্রথেল-বাড়ি কাল যদি ধরা পড়ে, তবে বাড়িউলী অক্ষতযোনি কুমারী কন্যা হবে—এ হেন দুরাশা করো না।" তাই আফসোস, হে মুশকিল-পানা মস্‌দরানা, এ গজব-মুসিবতের ওক্তে তুমি কোথায় ছিলিমে দম মেরে শিবনেত্র হয়ে হুরিপরীর খোওয়াব দেখছো?

সে অদেখা লিপির অজানা বাণী কিন্তু সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে পৌঁছে গিয়েছে বিশেষ করে ইরান আর তার সাকী পাকিস্তানে। নইলে মিস্টার আজীজ আহমদ

অকস্মাৎ তাঁর পূর্ব নীতি ত্যাগ করে বঙ্গ-প্রীতি দেখাতে আরম্ভ করলেন কেন? আমি তো শুনেছি, দুই পাকিস্তানে যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল তার জন্য কার্যত মিঃ আহমদই দায়ী। করাচী-পিণ্ডির নেতারা গোড়ার দিকে মরহুম পুং-পাকে কি পলিসি নেবেন স্বভাবতই সে সম্বন্ধে পাকাপাকি মন-স্থির করতে পারছিলেন না। তাই কার্যক্ষেত্রে উপস্থিত সর্বাধিকারী আজীজই অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে নীতি বাবদেও সদুপদেশ দিতেন—সে নীতি লৌহ-গোলক-নীতি। অবশ্য বর্তমান মিঃ আজীজ যদি প্রাক্তন চীপ সেক্রেটারী সেই আজিজই হন?—তবু ভালো, যার মারফতই একটা সমঝোতা হোক না কেন। দিল্লীর এক বাদশা নাকি খারাপ জায়গা থেকে একটি সুন্দরী আনালে পর, উজীর বিরক্তি প্রকাশ করেন। বাদশা বললেন, 'হালুয়া ভাল জিনিস, তা সে যে দোকান থেকেই আসুক না কেন—হালওয়া নীকু অস্ত্, কে আজ হর দুকান বাশদ।' এ স্থলে বলতে হবে, যেই নিয়ে আসুক না কেন।

লাইন অব রিট্রীট খোলা রাখো

তাই বলছিলুম "সেই ভাল, সেই ভাল।" আমরা চিরকালই শান্তি কামনা করেছি। তদুপরি ডানা-কাটা পরী কে না ভালোবাসে? ডানা-কাটা পরী পাকিস্তানকে কিয়ামততক দুশমনের নজরে দেখবো, লায়লীকে মজনুর চোখে দেখবো না, এমন কিরে কসম আমি কখনো গিলিনি—স্বাক্ষী এণ্টালির মৌলা-আলী। তবে কি না, অতীতের জাবর কেটে মনে ধোঁকা লেগে রয়, "মুসলিম বেঙ্গল" বুলি কপচানো আগাপাস্তলা পালটে "বাংলাদেশ" নামক ঢেঁকি গিলতে পিণ্ডির ইয়ার-আজীজানের কতখানি সময় লাগবে? আপনারা যা ভাবতে চান, ভাবুন, আমার সন্দেহ-পিচেশ মন জানে, পিণ্ডির ইয়াররা অবশ্যই আরো বিস্তর ন্যাজ খেলাবেন। এতক্ষণে আলবৎ তেনাদের এডভোকেট জেনারেল, লীগের একসপারটগুষ্টি বসে গেছেন, চুক্তিটির ফস্কে গেরো, লুপ হোল, কোন শব্দে, কোন ফুলস্টপ সেমিকলোনে আছে, চুক্তিটায় সাদা কালিতে এমন কি-সব লেখা আছে যাদের বদৌলতে তেনারা চটসে বেরিয়ে যাবেন খোলা মাঠে, আর আমাদের বেলা দেখবো, ফস্কে গেরো বজ্র-বাঁধন, ফাঁসির গিঁটে টাইট হতে হতে কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায়। (এবং আমাদেরও উচিত, এই একই কর্মে লিপ্ত হওয়া। কোনো কোনো দেশ গোপনে বিদেশেও পাঠায়) তুলনায় এনে স্মরণ করাই, ইতিমধ্যে নিকসন ক'বার দিব্যি দিয়েছেন, আমার মনে নেই,

সুপ্রীম কোর্ট "ডেফিনিট" রায় না দেওয়া পর্যন্ত তিনি টেপ-এর দলিল হাতছাড়া করবেন না, না, না। কিন্তু কুল্লে তুনিয়ার চেল্লাচেল্লি সত্ত্বেও "ডেফিনিট" বলতে তিনি কি বোঝেন, সে প্রশ্নটা সাফ ইনকার করে তিনি খামুশ! অথচ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ঐ "ডেফিনিট" কথাটা এ-প্রসঙ্গে বিলকুল ফজুল, বেকার। সুপ্রীম কোর্ট কেন, আমাদের মহল্লার বেকুব ছোঁড়াটা ঐ যে সেদিন তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিসম্পন্ন হাকিম হ'ল, সেও তো কখনো 'ইনডেফিনিট' এমন কোনো রায় দেয় নি, যার তেত্রিশটা অর্থ করা যায়। হয় জেলে যাও, নয় বাড়ি যাও—মাত্র তুটো অর্থওয়ালা ইনডেফিনিট রায়ও সে কখনো দেয় নি। ছোকরাকে শুধান গিয়ে, সে যখন ট্রেনিঙে ছিল, তখন তার গুরু তাকে বলেছেন কি, "রায় দেবে ডেফিনিট, সে রায়ের বিসমিল্লাতে লাল কালি দিয়ে লিখবে, 'ডেফিনিট' জাজমেণ্ট অব হাকিম অমুক।" সেটা হবে "ভেজা জল" বলার মত। শুকনো জল আমি কখনো দেখি নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নিষ্কর্মা "ডেফিনিট" শব্দটা এস্তেমাল করা হয়েছে, রায়টা আখেরে বিপক্ষে গেলে "নিষ্কর্মাটা" কর্মে লাগাবার জন্য। একেই বলে আইনের ফাঁক, ল'-এর লুপ-হোল। গুরু নিকসন যে ভেল্কি দেখালেন. পিণ্ডির চেলার কি গুরুমারা বিদ্যে দেখাতে কম যাবেন? এবং আমাদেরও এটা রপ্ত করা অতিশয় উচিত। চুক্তি ভাঙবার জন্য নয়, যে ভাঙতে চায়, তার মোকাবিলা করার তরে।

কিন্তু সরল পাঠক, এই পোড়াগুরুর ভ্যাঁ-ভ্যাঁতে কান দিয়ো না। বরঞ্চ গান ধরো,

> "নিশিদিন ভরসা রাখিস
> ওরে মন হবেই হবে।"

পৌষ মাস কেবা কার
পাঠানের হাহাকার

অবতরণিকাটি হয়তো মেকদারমাফিক হল না।

কারণ, চিন্তাশীল পাঠক হয়তো ভাবছেন, নিরক্ষর পাঠান বেলুচে এ-সব কথার মারপ্যাচ, আইনের ফাঁকি ফক্কিকারির কি আর বোঝে? এমনতরো মারাত্মক ভুল করবেন না। পাঠানের বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পায়, "করারনামা, করারদাদ।" ওদের কওমে কওমে হর-হামেশা লড়াইফসাদ এবং নিত্যি নিত্যে সলা-সুলেহ লেগেই আছে—করার-নামা,

করার-দাদ দিয়ে হয় তার অতিশয় সাময়িক তৎকালীন এবং ক্ষণভঙ্গুর অস্ত্র-সংবরণ, আর্মিষ্টিস। পীস ট্রিটি চিরন্তনী-শান্তি এহেন আজগবি সমাস তারা কখনো শোনে নি। করার ভাঙাতে চেম্পিয়ন হিটলার রিবেনট্রপ পাঠানের কাছে হেসে-খেলে দু'দশ বছর তালিম নিতে পারেন—করার-দাদে দফে দফে চুক্তি নির্মাণ, লুপহোল রক্ষণ, এবং তার বদৌলত চুক্তিপত্র থেকে মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে, সসম্ভ্রমে, একতরফা নিষ্ক্রমণ, এ-সব বাবদে যাবতীয় ফন্দি-ফিকির,সন্ধি-সুড়ুকের সম্রাট পাঠান। খাস কাবুলে কেউ কখনো এপয়েন্টমেণ্ট লেটার পায় না। পায়, চুক্তি-পত্র (করার-দাদ)। বেশুমার কপি সই করতে হবে আপনাকে—আপনি পাবেন কুল্লে একখানা। সরকার চাপ দিতে চাইলে দশ খানা কপি বেরিয়ে আসবে এক লহমায়। আপনি চাপ দিতে চাইলে সরকারের তাবৎ কপি গায়েব—গম্ভীর কণ্ঠে বলবে "গুমা শুদ", গুম হয়ে গিয়েছে। তারো বড়ো, হয়তো বলবে কোনো করার-দাদ "নেই, ছিলও না" "নীস্ত-ন-বুদ"—যার থেকে বাংলা "নাস্তা-নাবুদ" কথাটা এসেছে। বিশ্বেস না হয় চলন্তিকা খুলে দেখুন।

পাঠান বেলুচ নিরক্ষর। কিন্তু প্রত্যেকটি করার নামা তারা জের-জবর তক মনে গেঁথে রাখে। কিন্তু এহ বাহ্য।

বললে পেত্যয় যাবেন না, শতাধিক বৎসর ধরে ব্রিটিশ, শিখ, রুশ, আফগান, ইরান, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান—এঁদের ভিতর আপোসে কি সব চুক্তি-নামা তৈরি হল, কালি শুকোবার আগেই সেগুলোকে এক পক্ষ টুকরো টুকরো করলো (তিক্কা তিক্কা করদনদা'), এ-সব সাকুল্যে সংবাদ তাদের নখের ডগায়। এরই উপর নির্ভর করছে তার প্রধান আমদানী—লুটতরাজ। পূর্বেই বলেছি, চাষ-আবাদ তার কাছে অনেকটা আমরা যে-রকম পুরনো খবরের কাগজ বিক্রি করে এক খেপ রিক্সভাড়া তুলি-কি-না-তুলি গোছ। বিশেষ করে তার শ্যেন-দৃষ্টি পূর্বে ছিল ব্রিটিশের প্রতি, এখন "নেকনজর" ফেলে পাক-সরকারের দিকে। যখনই যে-সরকার, কি আফগান, কি পাকসরকার দুশমনের হামলা বা সে-ভয়ে বেকাবু, তখনই পাঠান বেলুচের মোকা। আর আল্লার কুদরতে আজকাল পাঠানের বারোয়ারি ড্রইংরুম, ছোটাসে ছোটা চায়ের দোকানেও বেতার। এখন হাওয়ায় যায় তাজাসে তাজা খবর। অন্ততঃ পাঁচটা দেশ পশতু জবানে পরস্পরবিরোধী খবর দেয় প্রতিদিন। আর আফগান চালিত কাবুল-বেতার এবং পাঞ্জাবী চালিত পাক-বেতারে বাক-যুদ্ধ—জংগে জবান—লেগে যায় তখন সে বেহদ আরাম বোধ করে—তার দিল খুশ, জান-ত-র-র-র !

এই যে পাক, হিন্দ, বাঙ্গালায় ত্রিভুজাকৃতি করার-দাদ হতে চললো এই বে-মুবারক আখবার শুবে পাঠানিস্তানের দিল-জান কলিজা-গুর্দা "তিক্কা তিক্কা" করে দেবে। এতে করে পাক তার পূর্ব সীমান্ত সামলে নিলো। সান্ত্বনা এই-টুকু, পাক সরকারের প্রতি অপ্রসন্ন কয়েক হাজার জাতভাই পাঠান সেপাই দেশে ফিরে এলে তাদের তাড়িয়ে যদি কিছু-একটা করা যায়। সদর দাউদও সেটা হিসেবে নিচ্ছেন। স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, আপন খুশিতে দাউদের হুংকারে বিব্রত, পিণ্ডি সরকার যুদ্ধ-বন্দীদের ফেরত নিচ্ছেন এই দুর্দিনে, বিশেষ করে নিকসনের দুর্দিন যাদের আপন দুর্দিন—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

পাক-পক্ষ দিল্লীতে প্রায় এক পক্ষ ধরে কেন গাঁইগুঁই, টালবাহানা করলেন, সেটা এখানে বসে আমি বলতে পারি, পাঠান জানে, তার প্রতিবেশী আফগান জানে, বেলুচ অবশ্য অতখানি ওয়াকিফ-হাল নয়। সে কাহিনী দীর্ঘ। বারান্তরে।

সেকাল একাল

ছেলেটা ডান হাত পেতে দিচ্ছে আর তার উপর পড়ছে সপাং করে লম্বা লিকলিকে কাঁটাওলা চাবুকের বাড়ি। অস্ফুট কণ্ঠে সে বলছে, "বরায়ে খুদা" আর এগিয়ে দিচ্ছে বাঁ হাত। ফের চাবুকের ঘা। এবারে ছেলেটা বললে "বরায়ে রসুল", এগিয়ে দিচ্ছে ডান হাত। করে করে চলতো ইস্কুল-বয়কে চাবুক মারা—খাস কাবুল শহরে—একদা। ছেলেটা তসবী জপার মত এক বার বলে "বর য়ে খুদা" পরের বার বলে "রায়ে রসুল' "বরায়ে খুদা" "বর য়ে রসুল" "বরায়ে—।" অর্থাৎ "আল্লার ওয়াস্তে (মাফ করে দিন)" "রসুলের ওয়াস্তে (মাফ করে দিন)।' কিন্তু আমাদের মত "আর করবো না, পণ্ডিত-মশাই কিংবা কসম খাচ্ছি মৌলবী সাহেব, আমি তামাক খাই নি। আমি ঘুমুচ্ছিলাম, কে জানি নে হুজুর আমার হাত দিয়ে তামাক খেয়ে গিয়েছে" এসব চেল্লাচেল্লি, বেকসুরীর ফরিয়াদ, রেহাই পাওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় আমাদের মত আমাদের বাপ-দাদার মত কাবুলী ছাত্র করে না। আমাদের বেকসুরীর ফরিয়াদ আমরা করেছি আমাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী—ছেলেবেলায়। কাবুলের ইস্কুল বয় তিফল-ই-মকতব করে তার ঐতিহ্যানুযায়ী। "বরায়ে খুদা, বরায়ে রসুল" ভিন্ন অন্য রা'টি কেড়েছো কি মরেছো! বেতের রেশন আরো দশ ঘা বেড়ে যাবে তৎক্ষণাতের দু' লহমা আগেই—আজ ফৌরন দো লহমা পেশতর।

কিন্তু হায়, ইতিমধ্যে "ব্যাকরণে" ভুল করে ফেলেছি, ধরতে পারেন নি তো? তাইতেই তো আগা-ই-আগা সম্পাদক-চক্রের চক্রবর্তী আমার বেশুমার ভুলে ভর্তি লেখা বেদম ছাপিয়ে দিয়ে আমাকে নাচান, আপনাদেরও নাচান। বলুন, বুকে হাত রেখে বলুন, আপনারা ক'জন সম্পাদক সা'বের চোখে আঙুল দিয়ে আমার অগুনতি গলৎ দেখিয়ে খাট্টা জবানে শাসিয়েছেন, আমার ধারাবাহিকের ধারা বন্ধ করতে? তা সে যাক গে। না করে ভালোই করেছেন।...হ্যাঁ, ভুলটা কি করলুম, সেই কথাই হচ্ছিল। বলে ফেলেছি "রেশন বেড়ে যাবে"। তা কখনো হয়? কি হিন্দুস্থান, কি পাকিস্তান, কি এই সোনার বাংলা—কবে মশাই, কোন্ মুল্লুকে রেশন বাড়ে? রেশন কমতে দেখেছে, বাড়তে দেখেছে কে, কবে, কোন রাঙা শুক্কুরবারে, কোন হীরের বাংলায়? সে তা হলে সাপের ঠ্যাং দেখেছে, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র দেখেছে।

বাস্তিনাদো

কিন্তু এ ধরনের বেত্রাঘাত কাবুলে ডাল ভাত। দেখতেই যদি হয়, তবে দেখে নেবেন, বাস্তিনাদো। আমি কখনো দেখি নি, তবে হতভাগার গোংরা-নোটা শুনেছি, অতি অনিচ্ছায়।

আমাদের হস্টেলে একজন আরেকজনের তলপেটের এক পাশে মাঝারি সাইজের একটা ছোরা ফাঁসিয়ে দেয়। প্রিন্সিপাল গয়রহ কোয়ার্টারে ছিলেন না। আমাকেই যেতে হল। যতদূর মনে পড়ছে, চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই হয় নি। বাগানে গাছতলায় ছেলেটাকে শুইয়া রেখে তাকে ঘিরে রয়েছে কয়েক-জন। তার মুখ হুবহু পচা মাছের পেটের মত ঘিনঘিনে পাঙাশ। একটা ছেলে কামিজ তুলে দেখালে পেটপিঠ পেঁচিয়ে লালে লাল চওড়া ব্যাণ্ডেজ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না, কী জঘন্য নোংরা কাপড় ছিঁড়ে পট্টি বাঁধা হয়েছে। আরেকটা ছেলে বললে, নাড়িভুঁড়ি হড়হড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সে আর তার দোস্ত দুজনাতে চেপেচুপে কোনো-গতিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পট্টি বেঁধেছে—বুঝলুম, এক গাদা মাল যে-রকম ছোট সুটকেসে যেখানে যা খুশি ঢুকিয়ে ডালার উপর দাঁড়িয়ে একজন লাফায়, অন্যজন কব্জা বন্ধ করার চেষ্টা দেয়, তারই অনুকরণে কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পট্টির উপর নিচ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত চুইয়ে চুইয়ে বেরুচ্ছে। আততায়ীকে একটা গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ছেলেটা ভির্মি যায় নি, তবুও। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। ভাবলুম, ভুল বকছে। না, একটা ছেলে বললে, আমাকে সে কি যেন বলতে চায়, আমি যেন কাছে গিয়ে কান পেতে শুনি। কাছে যেতে আধ-মরা গলায় বললে, আমি যেন তার সব অপরাধ মাফ করে দি। আমি বললুম, "তুমি আবার কি অপরাধ করলে? সেরে ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ছেলেটা 'আহ্' বলে চোখ বন্ধ করলো।

এর পরের কাহিনী দীর্ঘ। উপস্থিত সুখবরটা জানাই। দেড় মাস পর সে হাসপাতাল ছেড়ে ফের ক্লাসে ফিরে এল। কিন্তু এহ বাহ্য।

আমাদের ফরাসী অধ্যক্ষটি ছিলেন চৌকশ লোক, পুলিশকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দিয়ে, দফতরের কাবুলী হেড ক্লার্ক, খাজাঞ্চী, অনুবাদককে বললেন এ-দেশের প্রথানুযায়ী বিচার করে আততায়ীকে যেন সাজা দেওয়া হয়।

তাঁরা স্থির করলেন পূর্ব কথিত বাস্তিনাদো। আমার কিন্তু শোনা কথা। ছেলেটাকে মাটিতে বুক রেখে টান টান করে শোয়ানো হল। হাত দুটো সামনের দিকে প্রসারিত। দুহাতের উপর মাটির সঙ্গে জোরছে চেপে ধরে দাঁড়ালো মিলিটারি বুট পরা দুই চাপরাসী, দু'পায়ের গোছা সবুট চেপে দাঁড়ালো আরো দু'জন চাপরাসী। আরো জনা চারেক বুট দিয়ে পিঠ-কাঁধ সর্বাঙ্গ চেপে ধরে দাঁড়ালো চতুর্দিকে। তার পর পায়ের তলাতে—জানি নে কি ধরনের—চাবুক দিয়ে বেতের পর বেতের বেদম গুনে গুনে মার। বার দশের পর পায়ের তলা দু'টোতে, আর এক রত্তি চামড়া অবশিষ্ট রইল না। লালে লাল ক্ষতবিক্ষত জখমের উপর আরো কত ঘা মারা হয়েছিল সেটা আমি আর শুনতে চাই নি। ··দিন দশেক পরে একদিন দেখি, কুষ্ঠরোগীর মত পট্টি দিয়ে পা দু'টো সর্বাঙ্গে মোড়া অবস্থায় দু'টো লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে পা দু'টো মাটি ছোঁয়-কি-না-ছোঁয় অবস্থায় প্রাতকৃত্য সারতে যাচ্ছে। মাস দুই পর ফের ক্লাসে এল।

আর সব সহপাঠীরা মন্তব্য করেছিল, "ছেলেটার দারুণ বরাত-জোর। বিদেশী অধ্যক্ষ মধ্যস্থ না হলে, নির্ঘাত জেলে পাথর ভাঙতে হত নিদেন পাঁচটি বৎসর।" অন্য অত্যাচারের কথাটা সবাই জানতো—আসলে যে কারণে অধ্যক্ষ মধ্যস্থ হয়েছিলেন। জেলের সম-রতি-প্রবণ গার্ড সেপাইদের হাত থেকে ছোকরার নিস্তার থাকতো না।···এতদিনে এ-সব পাশবিক দণ্ডদান মকুব হয়ে যাওয়ারই কথা।

রণাঙ্গনে নব-নায়ক ছাত্রসমাজ

আফগানিস্তানে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খুব যে একটা আত্যন্ত পরিবর্তন হয়েছে এমত বিশ্বাস করার কারণ নেই। তবে একটা সত্য স্বীকার করতেই হবে; প্রাচ্যপ্রতীচ্যের আর-পাঁচটা দেশের মত দু'তিনটে নগরে, বিশেষ করে কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এদানি নানা বিষয়ে সচেতন হয়ে গিয়েছে। এটা অতিশয় স্বাভাবিক যুগধর্ম। বছরের পর বছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, নানা পাঠ্যপুস্তক মারফৎ বিশ্ব সংবাদ পড়ানো হবে, আর ছাত্রেরা সেই প্রাচীন সর্বাধিকারী রাজশক্তি তখনো মেনে নেবে—তা রাজা যতই মেহেরবান হন না কেন—ফল ভালো হোক, মন্দ হোক—সে-বিদ্যা প্রয়োগ করার প্রলোভন তার অতি অবশ্যই হবে। যেমন, দশ-বিশ বছর ধরে সেপাই অফিসারকে কুচকাওয়াজ, সমরবিদ্যা শেখানো হবে, আর তারা জল-জ্যান্ত লড়াইয়ে নেমে সেটা কখনো কাজে লাগিয়ে পরখ করে দেখতে চাইবে না, এটা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশা জহীর যে যৌবনের সাম্য ঐক্য স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে রাজশক্তিকে দৃঢ়তর এবং ব্যাপকতর করতে চেয়েছিলেন সেটা ন্যায়সঙ্গত না হলেও স্বাভাবিক, এমন কি আংশিক গণতন্ত্রমূলক সংবিধান মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পলিটিকসে একটা "রাজার দল" 'কিংস পার্টি' স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন, হুবহু যে-কাজটি সিংহাসন ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ড্যুক অব উইনজর করতে রাজী হন নি। পক্ষান্তরে ছাত্ররাও সেকুলার শিক্ষার ফল স্বরূপ এবং মক্তবের ভিতরে বাইরে মোল্লাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার দরুন রাজনীতিতে ঢলে পড়লো পেণ্ডুলামের অন্য প্রান্তেঃ বাইরের থেকে সাহায্য পেয়ে তারা হয়ে দাঁড়ালো মার্কস, মাও এবং এককাট্টা চরমপন্থীতে। তারই ফলে ১৯৬৯ সালে তাদের বিক্ষোভ, দাবী, স্ট্রাইক—গোটা আন্দোলনটা সর্বাংশে রাজনৈতিক ছিল না, ছাত্রসমাজের নিছক সুখ-সুবিধা কল্যাণকল্পে একাধিক স্ট্রাইকের আয়োজনও হয়েছিল—পুলিশের সঙ্গে ভীষণ সংঘর্ষে আন্দোলন এমনই মারাত্মক আকার ধারণ করলো যে, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে ছয় মাস কাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হল।

এর ফলে কিন্তু একটা তত্ত্ব জনসাধারণ, বিশেষ করে মোল্লাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলঃ সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বর্তমানে সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রধান শক্তিমান ছাত্ররাই। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, জনপদ অঞ্চলে

কওমদের ভিতর যেমন অশিক্ষিতের সংখ্যা অধিকতর ঠিক তারই সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে তাদের ধর্মোন্মাদনা মারাত্মক এবং সর্ব প্রগতিশীল সংস্কার তারা ঘৃণা করে।

তৎসত্ত্বেও ছাত্রসমাজ তাদের মাও মার্কস আন্দোলন আরো জোরদার করে তুলতে লাগল এবং তার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ১৯৭০-এ। লেনিনের বাৎসরিক জন্মদিনে একখানি কম্যুনিস্ট পত্রিকা তাঁর স্মরণে রচিত একটি কবিতাতে এমন সব প্রশস্তিসূচক হামদ ও নাৎ দোওয়াদরুদের শব্দ ব্যবহার করলো, যেগুলো সচরাচর আল্লা রসুলের স্মরণেই উচ্চারিত হয়।

তীব্র প্রতিবাদ, বিস্তীর্ণ জনপদব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করলেন মোল্লারা। যে-সব কওম তাঁদের সহায়তা করলো তাদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং সেই কুখ্যাত শিনওয়ারী কওম, যারা সর্বপ্রথম বাদশা আমানউল্লার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এবারেও তারা এমনই খাণ্ডারের মত রুদ্ররূপ ধারণ করলো যে অবশেষে ট্যাঙ্কসহ শাহী ফৌজ তাদের আক্রমণ করে ঐ অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলো।

লেনিনের প্রতি এই সব উচ্ছ্বাসময়ী প্রশস্তি এবং মোল্লা সম্প্রদায়ের প্রবল প্রতিক্রিয়ার শেষ ফল এই দাঁড়ালো যে, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে "ধর্ম সম্বন্ধীয়" একটা নূতন শাখা প্রবর্তন করা হল। এ-শাখার চালকগণ অহরহ সজাগ দৃষ্টি রাখেন, 'ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে' অর্থাৎ সাধারণ ছাত্রসমাজের সামান্যতম মতবাদ, কার্যকলাপ তাঁদের মনঃপূত না হলে 'কুফর' বিদা'ৎ হুঙ্কাররবসহ তীব্র প্রতিবাদ তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন।

দাউদ খান নাকি প্রথম দিন থেকেই ছাত্রসমাজের সমর্থন পেয়েছেন। তা'হলে স্বতই স্বীকার করতে হয়, ছাত্রকুলবৈরী মোল্লা সম্প্রদায় তাঁরও বৈরী। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, দাউদ মোল্লাদের এক বৃহৎ অংশের স্বীকৃতি পেয়েছেন। দাউদ দিবান্ধ নন। তিনি জানেন, মোল্লা ও তাঁদের চেলা কওমরা ছাত্রদের চেয়ে সংখ্যায় ঢের বেশী।

ছাত্ররূপ একটা ঝুড়িতে দাউদ তাঁর কুলে আণ্ডা রেখে আরব্যরজনীর অন-নশশারের খোওয়াব দেখবেন না।

নামে কি করে।

গোলাপে যে নামে ডাকো, গন্ধ বিতরে

এক নিক্সন-বৈরী মার্কিনই হতাশ সুরে বলছিল, "ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি ভালো করে বুঝতে হলে সকলের পয়লা এক ঝুড়ি নাম সড়গড় মুখস্থ করতে হয়। কটা লোকের সে সময়, সে উৎসাহ আছে? তার পর মুখস্থ করতে হবে তাঁদের পূর্ব-কীর্তি কেরামতীর ইতিহাস। কে রিপাবলিকান, কে ডেমোক্রেট; কে রিপাবলিকান বটেন কিন্তু ওয়াটের-গেটের কেলেঙ্কারির ঘেন্নাতে হয়ে গেছেন রিপাবলিকানদলের চাঁই নিক্সন-বিরোধী, কারা পয়লা-নম্বরী রিপাবলিকান এবং নিক্সনের অকারণ মেহেরবাণীতে কনট্রাক্ট পারমিট গয়রহ্ পেয়ে তাঁর প্রতি এখনো নেমক-হালাল, বিপদে পড়ে নিক্সন কাকে কাকে জল্লাদের হাতে না-হক সঁপে দিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি দফে দফে নাম-কাম মুখস্থ করতে পারেন—খুদ মার্কিন-ইয়াংকি পাঠকই ক'জন? তবু যারা টি-ভিতে ওয়াটারগেট তদন্তের জলসা আণ্ডাবাচ্চাসহ গুষ্টিসুখ অনুভব করতে করতে নিত্যি নিত্যি দেখেছেন তাঁদের পক্ষে মামলাটার গভীরে ঢোকা খানিকটে সহজ হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যে এত-সব বয়নাক্কা-আবদার বরদাস্ত করে আপন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে শেষ রায় দিতে পারেন ক'জন স্পেশালিস্ট?"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "আমরা বরঞ্চ বৃটিশের তরো-বেতরো নামের কিছুটা হদীস পাই, কিন্তু তোমাদের মার্কিন জাতটা ইংরেজ, জর্মন, ডাচ, ফরাসি, আরো কত বেশুমার জাত-উপজাত দিয়ে গড়া আস্ত একটা জগাখিচুড়ির লাবড়া-ঘ্যাঁট। ঐ ধরো মামলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-আলিঙ্গনে বিজড়িত, নিক্সনের ঘরোয়া, হুয়াইট হাউসের চাঁই চাঁই সচিব, কর্মকর্তাদের ইসমে মবারকের ফিরিস্তি: সকলের পয়লা যে দুই মহাপ্রভু এ-ফিরিস্তি ধন্য করেন, তাঁদের নাম খাঁটি জর্মন এরলিষমান, হালডেমান। অবশ্যই সাদামাটা মার্কিন নাগরিক কুল্লে ভিনজাতের নাম উচ্চারণ করে মাতৃভাষা ইংরিজি কায়দায়। এই সোনার বাংলাতেই উন্নাসিক পণ্ডিত মশাই মুকুলেশ্বর রহমান লেখেন মুখলেসুর রহমান-এর পরিবর্তে। তারপর ধরুন, ক্রমসফেলট, ক্লাইন, কের্লি, ৎিস্‌গলার এগুলো নিঃসন্দেহে জর্মন নাম। ফরাসী নাম অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু জাতে ভারি। খুদ ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম এ্যাগনো ফরাসী উচ্চারণ আইন্যো। এনার বিরুদ্ধেও ফৌজদারী তদন্ত চলছে, নানাবিধ "নজরানা" নিয়ে। এবং হাসি পায়, যখন "আইন্যোর" মূল অর্থ স্মরণে আসে। প্রথম অর্থ মেষশাবক, পরের

অর্থ সাধু-সরল-পবিত্র! হুবহু ঐ অর্থ ধরেন এরলিষমান। এ-নামের সরল অর্থ "সরল"! "সাধু, অনারেবল!" অধিকাংশ ঘড়েল জনের বিশ্বাস, ইনি ওয়া-টারগেট তদন্ত কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন তার চোদ্দ আনা ঝুট। ঐ সময় জর্মনিবাসী এক জর্মন, সুদূর স্বদেশ থেকে, বিখ্যাত এক মার্কিন সাপ্তাহিকে এরলিষমানের 'সরলার্থের' প্রতি সাদা-মাটা মার্কিন নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের তরে ব্যঙ্গ-রসের খোরাক যোগান।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রেসিডেন্ট ; না দেশের মঙ্গল ?

ভুট্টো সাহেবের যে রকম আজীজ, হিটলারের বরমান, হুবহু ঠিক তেমনি মিঃ নিক্সনের মহামান্য মিঃ হেনরি এ কিসিংগার। আমি জানি, একমাত্র খাস জর্মন ভিন্ন তামাম দুনিয়া উচ্চারণ করে কিসিঞ্জার। এস্তেক বিবিসি। পাঠক, একটু ধৈর্য ধরুন, পরে তাবত গুহ্য তথ্যতত্ত্ব স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে। এস্থলে বলা অপ্রয়োজনীয় যে আজীজ বরমান কিসিংগার চরিত্রে অতি অবশ্যই তফাৎ আছে ; মিঃ ভুট্টোর দোষগুণ যাই থাক, তিনি কখনো আজীজের ম্যাড়া বনবেন না। বাকিদের কথা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। কিন্তু এস্থনে সাতিশয় প্রয়োজনীয়, পাঠক যেন এই কিসিংগার প্রভুর প্রতি একটু নজর রাখেন। কিন্তু এঁর প্রেম বাংলাদেশ কখনোই পাবে না। কারণ ইনি ধর্মে, কর্মে সর্ববিষয়ে কট্টর ইহুদি। ইহুদিজনসুলভ তাঁর বিরাট নাসা-যন্ত্র, তথা ঘন-কুঞ্চিত প্রায় নীগ্রোসম কেশ যেন পাঠক তার ফোটোতে লক্ষ্য করেন। বিস্তর নৃতত্ত্ববিদের অভিমত, ফেরাউনের দাসত্বকালে, মিসরস্থ নীগ্রোদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে ইহুদিদের মস্তকে এই কুঞ্চিত কেশের উদ্ভব।...স্বভাবতই ইহুদি কিসিংগার তথাকথিত ইজরায়েলকে জানপ্রাণ দিয়ে মহব্বৎ করেন ; পক্ষান্তরে আমরা ফলস্তীনের গৃহহারা আরবদের মঙ্গল কামনা করি। তাঁরা যেন একদিন স্বদেশে সসম্মানে ফিরে যেতে পারে আমরা সেই প্রার্থনা করি—শরণার্থী হয়ে ভিন দেশে বাস করার পীড়া আমরা জানিনে, তো জানেন নিক্সন? তিন দিন আগে তিনি এক প্রেস কনফারেন্সে বলেন, "আরব-ইজরায়েলের মোকাবেলায় আমি নিরপেক্ষ (পাঠক বিশ্বাস করতে চান, তো করুন, সেটা আপনার মর্জি)। আমি চাই শান্তি।" পাঠক লক্ষ্য করবেন, "আমি চাই বিচার, আমি চাই জাস্টিস, ইনসাফ" এ কথা হুজুর বলেননি, কস্মিনকালেও তাঁর মুখ থেকে শুনি নি। কিন্তু শান্তি তো অতি

সহজেই হয়। মিশর, লেবানন, জর্ডান, লিবিয়াকে অন্ততঃ একশ' বছরের তরে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট এটম বম নিকসনের ভাণ্ডারে আছে। শান্তি ভঙ্গ তো এই "পাষণ্ডরাই" করছে। ইজরায়েল তো শব্দার্থে নিষ্পাপ—এরলিষমান, এ্যাগনোর মত! নিকসন তো এই মতই পোষণ করেন। তাঁর পিছনের ছায়াটি—কিসিংগার—তিনি তো টুইয়ে দেবার তাতিয়ে দেবার তরে আছেনই। তবে কিনা, সে শান্তিটা হবে গোরস্তানের শান্তি।

এই সুবাদে আরেকটি তত্ত্ব-কথার উল্লেখ করি। কিছু দিন পূর্বে আমি চিন্তাশীল পাঠককে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলুম, তাঁরা যেন নিকসনের চেলা ইরানের বাদশার প্রতি একটু নজর রাখেন। উপস্থিত সে-নজরটাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিতে পারেন। কারণ শাহ ইতিমধ্যে বিকল-ইনজিনওয়ালা নিকসন-জাহাজটি ত্যাগ করে আরেকটা উত্তম জাহাজে চড়েছেন। তিনি দেখলেন, নিকসনের ইঞ্জিন বিকল করে দিয়েছে ওয়াটারগেটের বেনো-পানি হড়হড়িয়ে তার সর্বাঙ্গে প্রবেশ ক'রে। ওদিকে সর্দার দাউদ গদিতে বসতে না বসতেই রুশ তাঁকে ঈদের (আনন্দের) আলিঙ্গন জানিয়েছে। এদিকে শুধু ওয়াটারগেট্ না, কুচক্রীরা নিক্সন আধা-আইনী বে-আইনীভাবে তাঁর প্রাইভেট বাড়ি দুটো কতখানি সরকারী পয়সায় খাড়া করেছেন সেটা ক্রমশঃ উপন্যাসের মত প্রকাশ করছে। এবং কিছু কিছু অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, ভিয়েট-নাম গয়রহ ছাড়াও তিনি কারণ-অকারণে পরিপূর্ণ শান্তিময় দেশেও গোপনে টাকা, অস্ত্রশস্ত্র ঢেলেছেন কি পরিমাণ? শাহ স্পষ্ট দেখতে পেলেন, শ্রাদ্ধ আখেরে যতদূরই গড়াক, না-গড়াক—প্রভু নিক্সন দুম করে আর কোম্পানির মাল বেশ কিছুকাল ধরে ইরানের দরিয়াতে ঢালবার হিম্মৎ পাবেন না। অর্থাৎ কি না, কিসিংগার মুনিব নিক্সনকে সে "পরামিশ" দেবেন না। মার্কিনীরা বলছে, দেশের স্বার্থের তরে তুমি যত চাও টাকা ঢালো, কিন্তু আপন প্রভুত্ব বাড়াবার জন্য নয়।

ইতিমধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটলো। মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, নিকসনের দ্বিতীয় ইলেকশনের সুপ্রীম কর্ণধার মিঃ মিচেলকে বাধ্য হয়ে সাক্ষ্য দিতে হয় ওয়াটারগেট তদন্তে। এক সিনেটর কিংবা ফরিয়াদী উকিল প্রশ্ন করেন, "তা হলে বলুন, আপনি দেশের স্বার্থকে নিকসনের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেন কিনা?" উত্তরে তিনি সগর্বে বলেন, "নিকসনের প্রেসিডেন্টরূপে জয়লাভকে আমি বৃহত্তর বলে মনে করি।" (!!) এই পরশু-দিনতক বিবিসি'র বিশ্বালোচনার সদস্যগণ এই বিকট নীতির উল্লেখ করে

বেকুবের মত বার বার তাজ্জব মেনেছেন। অতএব যদিস্যাৎ সরল পথচারী মার্কিন প্রশ্ন শুধোয়, "হুজুর তা হলে ইরানে এবং ১৯৭১-এ ইরানের মারফত (তৎকালীন) পশ্চিম পাকিস্তানে যে টাকা বন্দুক কামানটা ঢাললেন সেটা কি আপন লেজ মোটা করার জন্যে, না মার্কিন মুল্লুকের স্বার্থে?" —এ-প্রশ্নটা তো ছিদ্রান্বেষীর না-হক প্রশ্ন নয়। অতএব শাহও তড়িঘড়ি তাঁর প্রধানমন্ত্রীকে পাঠালেন মস্কো বাগে—দাউদের গদি দখলের তিন সপ্তাহ যেতে না যেতে। খুদায় মালুম, দফে দফে কত দফেই না নয়া জাহাজে চড়ে প্রধানমন্ত্রী করার-দাদ করার-নামা সই করলেন। শাহ ওদিকে পিণ্ডিকে পরামর্শ দিলেন, উপস্থিত জো-সো প্রকারের একটা সমঝোতা ইণ্ডিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে করে নাও। আমাদের রাশি এখন বেহদ বদ-বখৎ কম-বখৎ! আর পারো যদি, ঝটপট রুশ-কিশ্‌তীতে সওয়ার হও—না হয়, গলুইটাতেই দু'দিকে পা ঝুলিয়ে খোওয়াব দেখ, 'ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল', হাঁকিয়া নয়, হাঁটিয়া। কিন্তু পিণ্ডি যে চীনা-কানুর সঙ্গে বড্ড বেশী পীরিতির লেটপেট করে বসে আছেন! এখন শ্যাম না কুল? তবে—আজীজ যার নাম, রুশের সঙ্গে আজীজী করতে কতক্ষণ! কুল্লে দুনিয়া তাঁর খেশ-কুটুম "—বসুধৈব কুটুম্বকং"—বলেছেন স্বয়ং চাণক্য! তবে কি না চন্দ্রাবতী কুঞ্জে যেতে হবে চীনা বঁধুয়ার আঙ্গিনা দিয়া।

সংক্ষিপ্ত কিসিংগার কাহিনী

বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকের স্মরণে থাকার কথা শ্রীযুক্ত কিসিংগারের (ডাক নাম 'কিস্!') মূর্তিটি। ইনি খাঁটি ইহুদি। জন্ম জর্মনির ফ্যুর্ট শহরে। নাৎসিরা তাঁর কোনো ক্ষয়ক্ষতি করার পূর্বেই পিতা-মাতা তাঁর পনরো বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে আমেরিকায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। কি করে তিনি শেষটায় নিকসনের একমাত্র উপদেষ্টার আসন পেলেন সে কাহিনী দীর্ঘ, অতএব বারান্তরে।…'৭১ ডিসেম্বরের যুদ্ধ লাগার আগে এবং পরে এবং এখনো (যদিও ঠিক এখখুনি বড়ই বেকায়দায়) ইনি পাকিস্তানের মিলিটারি জুন্টাকে যে কোনো উপায়েই হোক খোদার খাসির মত পোষ্টাই খোরাক দিয়ে দিয়ে তাগড়া করে রাখতে চান। কেন? এইটে তাঁর সর্ববিশ্ব সম্বন্ধে যে পূর্ণাঙ্গ দর্শন তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ—ইরান-আফগান পাক-ভারত-বাংলাদেশ নিয়ে তার বড় একটা অধ্যায়। নিকসনকে তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন ধীরে ধীরে।

সে-কাহিনীও দীর্ঘ, আলোচনা বারান্তরে। এই দর্শনানুযায়ী ন'মাস ধরে নিকসন বাইরে নিরপেক্ষতার ভড়ং করতেন—যদিও সেটা এতই ঠুনকো ছিল যে, সামান্য ঠোনা মারতেই চৌচির হয়েছে একাধিক বার। অন্দর মহলে কিসিংগারের নেতৃত্ব আখেরী "ত্রাহি ত্রাহি" যে গোপনস্য গোপন সভা ৩, ৪, ৫, ৬, ৮ ডিসেম্বরে ৭১-এ হয়েছিল, সেগুলোর চিচিং ফাঁক করে দেন প্রাতঃস্মরণীয় প্রখ্যাত কলাম-লেখক জ্যাক এণ্ডারসন মার্কিন সংবাদপত্রে, ৫ জানুয়ারী ১৯৭২-এ। কি নিদারুণ বেহায়া ভণ্ডামী চালিয়েছিলেন মুনিব চাকর দু'জনাতে। হন্যে হয়ে কিসিংগার সব্বাইকে শুধোচ্ছেন, কি কৌশলে গোপনে পাক-সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা যায়? বিশেষজ্ঞরা মাথা নেড়ে বলছেন, ইরান, তুর্কীর মারফত ও হয় না। (পাঠানো হয়েছিল, আমরা জানি—লেখক)। শেষটায় কিসিংগার অতিষ্ঠ হয়ে বলছেন, "আমরা একটা স্টেটমেণ্ট দেব বই কি। আমরা, এই যেন অনেকটা সাধারণভাবে (ইন জেনরেল টার্মস)—অর্থাৎ ধরি মাছ না ছুঁই পানি ধরনের বলবো, পুব-পাকে একটা পলিটিকাল গুনজাইশ 'একোমডেশন'—অর্থাৎ সন্ধি না, চুক্তি না, (ছয় পয়েণ্ট মাথায় থাকুন।—লেখক) করে নেওয়ার পক্ষপাতী—আমরা। কিন্তু কোনো ধরা-বাঁধার মত (স্পেসিফিকস) অবশ্যই কিছু বলবো না, ইঙ্গিতও দেব না—যেমন ধরো মুজীবকে মুক্তি দেওয়ার মত।" এটা অন্দর মহলে।

বৈঠকখানায় নিকসনের পরিত্রাহি চীৎকার "অস্ত্র সম্বরণ করো, অস্ত্র সম্বরণ করো।"

ধন্য, সেই সিলেটী কবি, যিনি নিচের অমূল্য সুভাষিতটি রচেছিলেন। আমি শুধু "হতীন মা'র" (সৎমা-র) বদলে "কিসিংগার" ব্যবহার করেছি:—

"কিসিংগারের কথাগুলিন
মধু-রসর বাণী
তলা দিয়া গুড়ি কাটইন
উপরে ঢালইন পানী॥"

ছায়ার কায়ারূপ

বহু দিন ধরে হের হাইনরিষ এ. কিসিংগার কলকাঠি নেড়েছেন। কোনো রকমের সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ না করে মিঃ নিকসনের হয়ে ভিয়েতনাম বাবদে আলোচনা সভায় নেতৃত্ব করেছেন, বার বার। কূটনৈতিক "অসুস্থতায়" তিনি

ভুগেছেন অর্থাৎ যেখানে কোনো অসুস্থতা প্রকৃতপক্ষে নেই, অথচ ডিপ্লোমেটকে যে কোনো কারণেই হোক কিছুদিন গা-ঢাকা দিতে হবে, তখন তিনি যে ব্যামোর ভান বা ভণ্ডামী করেন সেটাকে বছর পঞ্চাশ ধরে ডিপ্লোমেটিক ইলনেস বলা হয়। ছেলেবেলায় আমরা অনেকেই "ক্লাসিক ইলনেসে", ভুগেছি, অর্থাৎ ক্লাসে না যাবার জন্য "পেট-কামড়ানো" "দাস্ত" ইত্যাদির শরণ নিয়েছি এবং দ্বিতীয়টার উভয়ার্থে বাহ্যিক প্রমাণ স্বরূপ বদনা-হস্তে ঘন ঘন, কখনো বা দ্রুতপদে, কখনো বা কাৎরাতে কাৎরাতে, বিশেষস্থলে গমনাগমন করেছি। হের কিসিংগার কূটনৈতিক অসুস্থতায় অকস্মাৎ ইসলামাবাদে কাতর হয়ে মারী পাহাড়ে যান, এবং তারপর তেমনি অকস্মাৎ উদয় হলেন চীন দেশে, যেন ডুব-সাঁতার কেটে, বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে হুশ করে কোঁকড়ানো চুলসুদ্ধ মাথা তুলে বিশ্বজনের বিস্ময় লাগালেন। দুনিয়ার লোক তাঁকে চিনে ফেলার পরও তিনি যতদূর সম্ভব পর্দার আড়ালে থাকাটা দানিশমন্দের সর্বোত্তম সিফৎ বলে মনে করেন। এ কর্মে তাঁর গুরু বরমান—হিটলারের ছায়া। ইহুদীজ কিসিংগার নাৎসি বৈরী জর্মনরূপে জন্ম নিয়েছিলেন ফ্যুর্ট শহরে। কুখ্যাত ন্যুরনবের্গ শহরের গা-ঘেঁষে এ শহর। নাৎসিবৈরী কিসিংগার পাঁড় নাৎসি বরমানের ঠিক উল্টোটা করবেন এই তো আমরা প্রত্যাশা করবো, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। ইংরেজ ফৌজী আপিসাররা নেটিভ পাঞ্জাবী অপিসারদের উপর যে চোটপাট করতো, তাই নিয়ে পাঞ্জাবীদের মনস্তাপের অন্ত ছিল না— যদিও তার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ তারা বড় একটা করতো না। তার কারণ অন্যত্র সবিস্তর বলেছি, পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার এই পাঞ্জাবীরাই যখন একদিন বৃটিশ-রাহু-মুক্ত হল তখন তারা এদেশে যা করলো সে তো বৃটিশকে সব দিক দিয়ে লজ্জা দিতে পারে।

আমার মনে তাই নিত্য একটা আশঙ্কা জেগে আছে, পাঞ্জাবী ফৌজ এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডারা যে সব নিষ্ঠুরতা এ দেশে করেছে আমরা যেন তারই পুনরাবৃত্তি করে না বসি। আমাদের মধ্যে যাদের চিত্ত দুর্বল, যারা একমাত্র অনুকরণ ছাড়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আপন কর্মপন্থা বেছে নিতে পারে না, তাদের কিছু লোক কিছুটা নিষ্ঠুরতা করবেই, কিন্তু আল্লার কাছে বার বার করুণ আবেদন জানাই, ওটা যেন আমাদের রক্তমাংসে প্রবেশ না করতে পারে, আমাদের ইমান যেন আচ্ছন্ন না করে তোলে। এইটেই আমার এ জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী ডরিয়েছি। অকারণে নয়। যুগে যুগে গুণীজ্ঞানীরা সাবধান বাণী শুনিয়েছেন, "পাপাচার নির্মূল করো, কিন্তু সে পাপের কালিমা

যেন তোমার গাত্র স্পর্শ না করতে পারে। তার চেয়ে পাপাচারী হাতে শহীদ হওয়া ঢের ঢের ভালো।”……আমি জানি, এ প্রস্তাবনাটি এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তর না হলেও এতখানি সবিস্তর বলাটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু যে ভয় আমাকে আজীবন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী শঙ্কাতুর করে রেখেছে সেটা এ-জীবনে অন্তত একবার সংক্ষেপে উল্লেখ না করে থাকতে পারলুম না। বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও যুগ-যুগ-ধাবিত নিষ্ঠুরতা অপরিবর্তনীয় রয়ে গেছে—এই তো সর্বনাশ!

কিসিংগার দেশত্যাগী হন পনেরো বৎসর বয়সে। নাৎসিরা ক্ষমতা লাভের প্রায় চার বৎসর আগের থেকে, দেশময় না হলেও ফ্যুর্ট-ন্যুরনবের্গ অঞ্চলে যে নিষ্ঠুরতা দিয়ে জনগণের—বিশেষ করে ইহুদীদের—মনে ত্রাসের সঞ্চার করে, তার লক্ষণ যেন আমি কিসিংগারের কার্যকলাপে মাঝে মাঝে দেখতে পাই। খাঁটি নিষ্ঠুরতাটার কথা হচ্ছে না। মানুষ যে নিষ্ঠুর হয় সেটা সর্বাগ্রে বোঝাবার জন্য যে তার শক্তি অসীম, তোমার একমাত্র কাজ তার বশ্যতা স্বীকার করা। কবির ভাষায়,

> “পালোয়ানের চেলারা সব
> ওঠে সেদিন খেপে,
> ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প
> সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
> বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায়
> জাগে দানব ভায়া
> গর্জি বলে ‘আমিই সত্য,
> দেবতা মিথ্যা মায়া’।”

ব্রাউন-শার্ট, এস এস, হিমলার হিটলারের গর্জন—তারাই সত্য। তাদের পশুবলেই সত্য শেষটায় একদিন লোপ পেল। কিন্তু হায়, এখনো আজো তাদের দর্প দম্ভ শুনতে পাই বহু জর্মন পলিটিসিয়ানের জলজ্যান্ত কণ্ঠে, কন্টিনেণ্টে, মার্কিন মুল্লুকে। হাঁ, দেশকালপাত্র ভেদে অবশ্যই কখনো নিষ্ঠুর রূপে কখনো বা মৃদু কণ্ঠে সে স্বৈরতন্ত্র—ডিক্টেটরি—আত্মপ্রকাশ করে। তার ক্রূরতম নীতিধর্ম-হীন স্বপ্রকাশ ইজরায়েলের গোড়াপত্তনের দিন থেকে। এই ইহুদীরাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছিল হিটলারের হাতে। হিটলার অবশেষে আইন পাস করলেন ইহুদিদের কোন রাষ্ট্রাধিকার নেই, জর্মনি তাদের মাতৃভূমি নয়। এবং সবচেয়ে বড় বিস্ময়, রূঢ়তম ট্রাজেডি—এই সব বাস্তুহারা ইহুদীরাই ফলস্তীনে

গিয়ে লেগে গেল সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নর-নারী, আবাল-বৃদ্ধ শিশুকে আরবদের আপন মাতৃভূমি থেকে বাস্তুহারা করতে। কিসিংগার পরিবার বাস্তুহারা হয়ে পেয়ে গেলেন, বিপুলতর রাষ্ট্র আমেরিকা—যেন বিশ্বভুবন দুবিঘার পরিবর্তে।

ভিন দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর কট্টর আত্মাভিমানী জন তার ঐতিহ্যগত আচার-ব্যবহার জোরসে পাকড়ে ধরে থাকে, সাধারণ জন সে দেশের জনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, আর ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদী জন সর্ব ঐতিহ্য, সর্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয় শুদ্দুমাত্র সাফল্য লাভের তরে। পিতা কিসিংগার কোন পন্থী ছিলেন, বলা কঠিন। পুত্র ওসব পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটতে চান না, তিনি যে নিজকে একেবারে আগা পাস্তলা খাঁটির খাঁটি বনেদী খান্দানী মার্কিন রূপে পরিচিত করতে চান সে বিষয়ে মার্কিন-অমার্কিন সবাই নিঃসন্দেহ।

নামটা নিয়েই শুরু করি। প্রথম নাম, হেনরি। জর্মনে বলে হাইনরিষ, ফরাসীতে বলে, আঁরি। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তাঁকে সব্বাই হাইনরিষ নামে ডেকেছে, তিনিও তাই লিখেছেন। ইহুদী কবি হাইনরিষ হাইনে অধিকাংশ জীবন কাটান প্যারিসে নির্বাসনে। কিন্তু তাঁর ছিল গভীর দেশপ্রীতি তথা আত্মাভিমান। তিনি হাইনরিষকে পাল্টে তার ফরাসীরূপ "আঁরি" লেখার প্রয়োজন কখনো বোধ করেননি। রোজোভেল্ট পরিবার গোড়ার থেকেই সব্বাইকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা জাতে ডাচ এবং ইংরেজী কায়দায় রুজভেল্ট উচ্চারণ তাঁরা পছন্দ করেন না। কিসিংগার উচ্চারণের বেলাও তাই। প্রাক্তন জর্মন প্রধানমন্ত্রী কিসিংগারের শেষাংশের উচ্চারণ যে '—গার', এবং 'জার' নয় সে তথ্য সবাই জানে। বক্ষ্যমান হাইনরিষ কিসিংগার ইচ্ছে করলেই পাঁচজনের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে নির্দেশ দিতে পারেন 'জার' না করে যেন 'গার' উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু তিনি আমাদের পাড়ার হরিশ চন্দ্র সান্যালের লিখিত হরস সি স্যাণ্ডাল এবং কালিপদ মিত্রের পরিবর্তে ব্ল্যাক ফুটেড ফ্রেণ্ডই পছন্দ করেছেন। এনারা খাস সায়েব হতে চেয়েছিলেন, উনি চেয়েছিলেন নির্ভেজাল মার্কিন হতে। হেনরি আর কিসিংগারের মাঝখানে একটা ইংরিজি অক্ষর "এ" আছে। অক্ষরটা কোন নামের আদ্যক্ষর সেটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি। বিবেচনা করি, খুনীয়া লোটকা বদবোওয়ালা টিপিকাল ইহুদি নামই হবে, যাঁর অস্নাত, অধৌত ইহুদি খুসবাইটি দুর-দরাজতক ভরপুর ম ম করে। অতএব ও নামটা চেপে যাও বিচক্ষণ ঘড়িয়ালের মত, শুদ্দুমাত্র 'এ' দিয়ে বাকিটা রাখো।

এতখানি ছড়িয়ে ছিটিয়ে কেবলমাত্র কিসিংগারের নামটি নিয়ে লোফালুফি করার মাধ্যমে আমি শুধু মাফ চেয়ে বলতে চাই, তুমি যে ইহুদি তুমি যে জাত-মার্কিন নও, সেটা চেপে গিয়ে মার্কিনদের হনুকরণ করো কেন? (টু ইমিটেট-এর অনুবাদ 'অনুকরণ'; টু এপ-এর অনুবাদ 'হনুকরণ')। ইহুদিদের ভিতর বেশুমার সজ্জন আছেন, মার্কিনদের চেয়ে অমার্কিনদের ভিতর ভদ্রজন বে-এন্তহা বেশী।

এ সব ব্যাপারি অতিশয় সাধারণ। কিন্তু অসাধারণ নাকি কিসিংগারের প্রতিভা এবং মানবিক গুণরাজির সংমিশ্রণ।—এ সত্য মার্কিন মুল্লুকের উত্তম উত্তম রাজনীতিবিদরা স্বীকার করেছেন। রবার্ট মেকনামারার মতামতের মূল্য নিশ্চয়ই বহুগুণ-গ্রাহ্য। তিনি বলেন, কিসিংগারের ভিতর তিনটি অসাধারণ গুণের সমন্বয় হয়েছে; জর্মনদের কর্ম করার সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধতি (সিসটেমাটিক রীতিবদ্ধতা), ফরাসীদের স্পর্শকাতরতা এবং মার্কিনদের উদ্যম (কাজকর্মে অফুরন্ত উৎসাহ, অদম্য নিষ্ঠা)। তাঁর ডক্টরেট থিসিস ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, নাম "এটম বম এবং পররাষ্ট্র নীতি"—"কের্ণাফেন উনট আউস-ভের্টিগে অলিটিক।" এই পুস্তক। ঐ বৎসরই পরিবর্ধিত আকারে "এ ওয়ার্লড রিস্টোর্ড" নামে প্রকাশিত হয়।

ইউনিভার্সিটিতে কিসিংগার অতি সহজেই অধ্যাপক পদ পান। পরবর্তী-কালে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হলে এক সুরসিক গুণী তাঁকে 'প্রফেসর' এবং 'প্রেসিডেন্ট' দুই শব্দের সমন্বয় করে সম্বোধন করেন "মিঃ প্রফাসিডেন্ট বলে।" নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও কিসিংগারের কেমন যেন জন-সমাজে নিজের ব্যক্তিত্ব ও উপস্থিতি অযথা দৃঢ়তাসহ প্রকাশ করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা লেগে থাকে এবং আপন বুদ্ধিবৃত্তি (ইনটেলেকট) সম্বন্ধে প্রকাশ পায় তাঁর সীমাহীন ঔদ্ধত্য। এ মন্তব্যটা আমার কাছে বড় অদ্ভুত ঠেকে। নাৎসিরা যখন ইহুদিদের উপর চোটপাট করছে সে সময়টা কিসিংগারের বারো থেকে পনরো আয়ুষ্কাল—আমি ঠিক সেই ক' বৎসরেই বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার সহপাঠী ইহুদিরা যে তখন কতখানি মানসিক দুশ্চিন্তায় পীড়িত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত ছিলেন সে স্মৃতি আমার কখনো ম্লান হবে না। এঁরা যে তখন হীনমন্যতার (ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেকসের) সহজ শিকার হবেন, সেটা অনায়াসেই বোঝা যায়। তাই মনে আসে আবার সেই নীতিবাক্য: জালিম তার জুলুমের অনেকখানি রেখে যায় তার শিকারের (মজলুমের) চরিত্রসত্তায়। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা যায়, তার চিন্তাধারায়

কার্যকলাপে অহেতুক দম্ভ, অকারণ অপমানজনক আচরণ।

নিক্সনের কর্ণধার, "প্রাইভেট নয়নম্বর" ডিটেকটিভি উপন্যাসের হী-ম্যান হীরো "ওয়াশিংটন ০০৯"; এবং সর্বশেষে "প্রভুর বিবেক স্পন্দন" এই হর-ফন-মৌলা কিসিংগার। ইনি নিজের কার্যভার কমাবার তরে কখনো কোন ডেপুটি রাখেন নি—বরমানও রাখতেন না—অধঃস্তন কর্মচারীদের কড়া মানা, তাঁরা যেন কখনো সরাসরি নিক্সনের সম্মুখীন না হয়। তদুপরি তিনি কংগ্রেস, ব্যুরোক্রাটি এমন কি গণশক্তির আধার ভোটারদের অতিশয় তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন। তাঁর মতে, সুষ্ঠু পররাষ্ট্র নীতি চালাবার পথে এরা ন্যুইসেনস, বেকার ঝামেলাময় বাধা মাত্র।

ইনি হতে চলেছেন, কিংবা ইতিমধ্যে হয়ে গেছেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। এবারে লাগবে ভানুমতীর খেল—অবশ্য ওয়াটারগেট-ফাঁড়াটা কাটাতে পারলে। পাঠক সেদিকে নজর রাখবেন। নইলে আমি এতখানি লিখতে যাবো কেন? অথচ তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন সম্বন্ধে এখনো কিছু বলা হয় নি। হবে। ধীরে রজনী, ধীরে।

সাধু সাবধান!

প্রথম লেখাতেই যদি লেখক লম্বা-চৌড়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করেন, তবে পাঠকমাত্রই বিরক্ত হয়। সে-পরিচয় দিতে হয় ধীরে ধীরে, টাপেটৌপে, মোকা-মাফিক। এই বেলা তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ নিতান্তই বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে।

অস্বীকার করবো না, একদা টুকলি করেই হোক, এগজামিনারকে প্রলোভন দেখিয়েই হোক, দু'একটা আজেবাজে পরীক্ষা পাস করেছিলুম। তার পর মাঝে-মধ্যে দু'একখানা বই, পত্র-পত্রিকাও পড়েছি। কিন্তু স্বরাজ পাওয়ার বছর দশেক পর থেকে দেখতে পেলুম, কি ভারত, কি (মরহুম) পুব-পাক সরকার উঠে-পড়ে লেগে গেছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করতে এবং যেটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পরে,—শিক্ষিতকে অশিক্ষিত করতে। খবর এল, সরকার হার্ড-কারেনসি বাঁচাতে চান। ইংরেজ আমলে এবং স্বাধীনতার গোড়ার দিকে থ্যাকার দাশগুপ্ত কোম্পানীকে নেটিভ-টাকা মেড়ে দিলেই তারা ইংরেজি, ফরাসী, জর্মন যে-ভাষার যে-বই চান, আনিয়ে দিত। এখন আর সেটি চলবে না। সরকার বাছাই বাছাই কোম্পানিকে বিদেশী মুদ্রার 'কোটা' দেবেন। আপনি কি বই চান, তাদের জানাবেন। তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। সরল পাঠক, উল্লাসে নৃত্য জুড়েছেন তো? আমারও চিত্ত জুড়ালো! উল্লাসভরে বইয়ের অর্ডার দি। নো রিপ্লাই। কেন? খবর নিয়ে জানলুম, পুস্তকবিক্রেতারা যে 'কোটা' পান তাই দিয়ে জাহাজ জাহাজ টিকটিকি নভেল আর খাবসুরৎ সেক্সের বই আনান ৪০ থেকে ৬০ পার্সেণ্ট কমিশন! আর আমি চেয়েছি, হের ডক্টর কিসিংগারের জর্মন ভাষায় লেখা কেতাব,—"এটম বমের ভয় দেখিয়ে কি প্রকারে বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যায়," মোটামুটি কেতাবের নাম ঐ। সে-বই একখানা আনালে পুস্তকবিক্রেতা কোনো কমিশনই পাবেন না, কিংবা পাঁচ পার্সেণ্ট! আমার এক ক্যাপিটালিস্টি পয়সাদার কম্যুনিস্টি ইয়ার অনেক ঝুলোঝুলি করার পর পুস্তকবিক্রেতা, সত্য সত্যই মোটা কমিশনের লোভ কাটিয়ে তাঁকে বললেন, আমি যদি একই কেতাবের—আবার বলছি একই কেতাব, পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়—একই কেতাবের পাঁচ কপি এক অর্ডারেই কিনি, তবে তাঁরা বিষয়টি মেহেরবাণীসহ বিবেচনা করে দেখবেন। শুনুন পাঠক, একই বইয়ের পাঁচ কপি! আচ্ছা বলুন তো, খুদ দ্রৌপদীকে যদি একই রং-ঢঙের, হুবহু একই ধরনের, পাঁচখানা

কার্বন-কপির মত পাঁচটা স্বামী দেওয়া হতো তা'হলে তিনি কি চাঁদ-পানা মুখ করে পাঁচ দফে কবুল পড়তেন ?...এবং ভুলবেন না, তাঁকে রোক্কা টাকা ঢালতে হয় নি। তা সে যাক গে। কিন্তু এস্থলে বলে রাখি, আমি সরকারের সমালোচনা কস্মিনকালেও করি নে। বরঞ্চ না খেয়ে মরবো, তবু হাঙ্গার-স্ট্রাইক করতে আমি রাজী নই। সরকার বইয়ের বদলে গোবর কিনে যদি দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে নিরন্নকে অন্ন দিতে পারেন, তবে আপত্তি করার মত অত বড় পাষণ্ড আমি নই। আর ব্যক্তিগতভাবে আমার কীই বা লাভ-লোকসান ? আমি ছিলুম অশিক্ষিত, থাকবো অশিক্ষিত। পূর্বোক্ত জর্মন বই পেলে আমি কি রাতারাতি শহীদুল্লা হয়ে যেতুম ? লাইব্রেরীর চাপরাসী দিন-ভর হাজার হাজার বইয়ের মধ্যিখানে বাস করে শেষটায় কি শিক্ষামন্ত্রীর পদে প্রমোশন পায় ? তবে প্রসঙ্গটা তুললুম কেন ? বলেই ফেলি। আজ আবার শব-ই-বরাৎ ! মাঝে মাঝে এ-বই সে-বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে সরল পাঠককে তাক লাগাবার কুমৎলব আমার হয়। তখন যেন আমার কথা বিশ্বাস করে ফাঁদে পা দেবেন না।

শক্তির ভারসাম্য

হের ডক্টর ফিল হাইনরিষ কিসিংগারের চিত্তজগতের গুরু প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, তৎকালীন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর ফরেন মিনিস্টার (১৮০৯--১৮২১) ক্লেমেনস মেটারনিষ। নেপোলিয়নের পতনের পর লণ্ডভণ্ড ইয়োরোপে যখন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সুবো-শাম কামড়াকামড়ি চলছে, তখন মেটারনিষ প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে ভিয়েনাতে নিমন্ত্রণ করে একত্র করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, তাঁরই যুক্তিতর্ক অসাধারণ মেলামেশা করার ক্ষমতা ইয়োরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সীমা-নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। আজকের দিনে যারা ইউনাইটেড নেশনসের কার্যকলাপ চোখ মেলে দেখেন তারা এ কর্মটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে করবেন। মেটারনিষ ভাগ-বাঁটোয়ারা করার সময় যে নীতি অবলম্বন করেন সেটা আজও 'মেটারনিষ সিসটেম' নামে প্রখ্যাত। এ নীতির মূলে ছিল ভারসাম্য। অর্থাৎ ইয়োরোপকে এমনভাবে বিভক্ত করতে হবে, যাতে করে কোনো রাষ্ট্রই যেন বড্ড বেশী বলবান না হতে পারে, এবং শেষটায় গুণ্ডার মত দুবলা রাষ্ট্রের কান পাকড়ে আপন স্বার্থ গুছিয়ে না নিতে পারে।* অপকর্মের ভিতর ঐ ভিয়েনা কংগ্রেসে সিংহলকে আনুষ্ঠানিক-

ভাবে ইংরেজের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই—পাঠক, ঠিক ধরেছো—ইংরেজই সকলের পয়লা কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের ভাঙ্গা ত্যাগ করে আপন চর-এ ঘাপটি মেরে বসে রইল। নীতিটার কিস্মৎ কিন্তু ইংরেজই মালুম করতে পেরেছিল সব চেয়ে বেশী। এ সব দলাদলির একশ' বছর পরও প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ইয়োরোপের ভারসাম্য রাখবার জন্য হিটলারকে খাইয়ে-দাইয়ে পোস্টাই করেছিলেন স্তালিনের সঙ্গে আখেরে লড়বে বলে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
গুলি খান-খানা খান

পাঠক অধৈর্য হবেন না। কারণ এ ছাড়া অন্য গতি নেই। কে বিশ্বাস করবে বলুন, সুদূর মার্কিন মুল্লুকের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সঙ্গে এই গরীব বেচারী বাংলাদেশের—বাংলাদেশ কেন, কুল্লে বিশ্বের বরাৎ বিজড়িত। 'বরাৎ' শব্দটি ইচ্ছে করেই বললুম। কারণ শবেবরাতের রাত্রেই বেতারে শুনতে পেলুম, (পরের দিন খবরের কাগজ ছুটিতে ছিলেন বলে সে খবর পাকাপাকি-ভাবে জানতে পারলুম না, পাঠক আমার তরে আধেক ইঞ্চি মার্জিন বা গুঞ্জাইশ রাখবেন) যে-হের ডক্টর কিসিংগার তাঁর মিত্র, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী রজার্সকে ঠেলা মেরে সরিয়ে, আপন ছায়ারূপ পরিত্যাগ করে কায়ারূপ ধারণ করতে যাচ্ছেন, অর্থাৎ তাঁর গদিতে বসবেন, তিনি সিনেট সদস্যদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'নাটকীয় তেমন কিছু একটা পরিবর্তন ঘটে নি, তবে গত ছ'মাস ধরে ভারত এবং বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক উন্নতি লাভ করেছে।" কাষ্ঠরসিক ফোড়ন দেবে, ওয়ার্স থেকে ব্যাড-এ এসেছে, নিকৃষ্টতর থেকে নিকৃষ্টে পৌঁচেছে। এর পর মুহূর্তেই বলবেন, "কিন্তু পাকিস্তানের বড্ড বেশী ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তাকে সাহায্য করতে হবে।" আহা, বাছা রে, পুব-পাককে পেঁদিয়ে পেঁদিয়ে তোমার হাতে বড্ড ব্যথা ধরেছে। এসো, যাদু, একটা গোল্ড ইনজেকশন দি। পরে, চাই কি, এক থালুই এটম-আণ্ডা পাঠিয়ে দেব'খন।

স্মরণে আসছে না, বলেছি কি না, কিসিংগার-নিক্সন গলাডা কাড্যা ফালা-ই-লেও মিঃ ভুট্টোকে ফৌজী জুন্তার "ফী নারি—" পড়তে দেবেন না। হ্যাঁ, জুন্তার খুঁটি এ-দিক ও-দিক সরাও, দু-চারটেকে রাজসিক পেনসন দাও—কিন্তু হাঁক দিলে যেন পুকুরের ওপার থেকে লাঠি হাতে তড়িঘড়ি অকুস্থলে হাজির

হয়। আর ঐ বস্তা-পচা সিস্টেমে জুস্তার বেশী লোককে ইলচির পাগড়ি পরিয়ে ভিনদেশ পাঠিয়ো না। কে জানে, কবে লেগে যাবে ভারত, আফগান, রুশ-চীন কার সঙ্গে। এস্তেক বেলুচ পাঠানকে ঠ্যাঙ্গাবার তরে টিক্কা খানের তো কুইনটুপ্লেট ভাই নেই! জুস্তা ভাঙলে ওদের ঠেকাবে কে?

হঠাৎ কিসিঙ্গার এ-হিম্মৎ যোগাড় করলেন কোথা থেকে? এ্যাদ্দিন তো প্রভু-ভৃত্য—অথবা ভৃত্যের বেশে 'প্রভু—দু'জনাই তো গোরস্তানী খামুশী এখতেয়ার করেছিলেন। ঝপাঝপ স্টেটমেণ্ট, দেমাতি, এস্তেক প্রেস-কনফারেন্স দিতে শুরু করেছেন হুজুর, আর ইয়ার বুক ফুলিয়ে সিনেটের সামনে বলছেন, "পাকিস্তানকে মদদ দিয়েছিলুম—বেশ করেছিলুম। ফের দেবো" ছুঁচো জ্যাক এণ্ডারসনকো মারো গুলি—সেটা বলেছেন মনে মনে। আর স্বয়ং নিক্সন ওয়াটারগেট তদন্তের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সিনেটরদের খেতাব দিয়েছেন, কিচিরমিচির করনেওলা সব কথাতেই 'না-মনজুর! না মনজুর!' 'চিল্লি মারার নবাব সায়েবের পাল'—ইংরেজিতে "ন্যাটারিং নবাবস অব নিগেটিভজম"। কবি নিক্সনের তা'হলে এই ন'অক্ষরের অনুপ্রাসের প্রতি বিলক্ষণ দিল-চসপী আছে। আমার বাংলা তর্জমাটা বড্ড কুশাদা হয়ে গেল, কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন, মূল ইংরেজিতে 'নবাব' শব্দটি আছে, সায়েবী উচ্চারণ অবিশ্যি "নইবব"। নিক্সন এখানেই ক্ষান্ত দেন নি। স্বয়ং কটু বাক্যের জহাঁবাজ 'নইবব' নিক্সন মেহমান জাপানী প্রধানমন্ত্রীর 'স্বাস্থ্য পান' করার সময় বলেছেন, "ওরা সব সামলাক তাদের গম-পেরেশানী, ফালতো হাবিজাবির আক্রোশ"—ভাবখানা এই, "আমি এগিয়ে যাবো ড্যাং ড্যাং করে"। ইংরেজ সচরাচর এ ধরনের বিদেশীয় বড়ফাট্টাইয়ে ভর্তি বগল-বাজানোর উপর নজর দেয় না। কিন্তু এস্থলে তাঁদেরই এক পয়লা নম্বরী সম্পাদক বলেছেন, "উঁহু! এবার থেকে হুজুরকেই ঐ গম-পেরেশানী দিয়ে নিত্যি নিত্যি লাঞ্চ ডিনার খেতে হবে।" হয়তো হবে, কিন্তু আমার মনে লয়, হাওয়া যেন হঠাৎ করে উল্টো দিকে ভর করেছে।

রতি-বল-বর্ধক কিসিংগারী সালসা

মেটারনিখ নীতিতে—শক্তির ভারসাম্যে—কিসিংগারের অচল বিশ্বাস। কিন্তু এই নীতিটা হালফিল কাজে খাটাতে হবে অন্য পন্থায়। মার্কিনের হাতে আছে এটম বমের ভাণ্ডা। সেই ভাণ্ডার ভয় দেখিয়ে দুনিয়ার কুল্লে রাষ্ট্রকে বলে দেব, কে

কতখানি শক্তিবান হবার অনুমতি পেল। এইটেই ছিল ডঃ কিসিংগার-থীসিসের মূল বক্তব্য। বইখানা পড়ে নিক্সন তদ্দণ্ডেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ক্ষমতা লাভের পর নিক্সন ডেকে পাঠালেন কিসিংগারকে ঐ "শক্তির ভারসাম্য" কাজে লাগাতে। এখানে দু'টি তথ্য বলে নেওয়া ভালো। কিসিংগারের মতে, 'শক্তির ভারসাম্য' তো বটেই, কিন্তু সেটা এখন আসবে এটম বমের "ভীতির ভারসাম্য" রূপে, কিন্তু নিজকে থাকতে হবে শক্তিমান। এবং তাঁর আপন মাতৃভাষা জর্মনে কিসিঙ্গার ঝেড়েছেন একটি লাখ কথার এক কথা : "মাখট ইসট ডের গ্রেয়াসটে আফ্রডিসিয়াকুম"—অর্থাৎ "পলিটিকাল শক্তিই ('মাখট' ইংরিজি 'মাইট') সর্বোৎকৃষ্ট আফ্রডিসিয়াক'—যে ঔষধ রতিশক্তি বাড়িয়ে দেয়, পঞ্জিকায় যে-সব মলম-বড়ির চটকদার বিজ্ঞাপন অন্ধেরও চোখ এড়াতে পারে না, তার ভদ্র নাম এফ্রডিসিয়াক। দ্বিতীয় তথ্য, দুশমন পরাজিত হলেও মজলুমের উপর তার প্রভাব রেখে যায়—এটা পূর্বেই বলেছি। শক্তির উপাসক হিটলার দেখিয়েছেন, শক্তিতে ভাটার টান লাগার সম্ভাবনা দেখলেই শক্তির ভড়ং দেখাবে মাসল ফুলিয়ে, উরু থাবড়ে। এটা তো ভালো করে রপ্ত করেছেনই কিসিঙ্গার, তদুপরি হিটলারের গুরু শক্তির মূর্তিমান প্রতীক বিসমার্ক (ইনি মেটারনিষের সদুপদেশ নিতেন আখছারই) সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখে তাঁরই পন্থায় শক্তি সাধনায় নিজকে বহুপূর্বে চালিত করেছেন।

আকস্মিক না প্ল্যান-মাফিক

এইবারে কিসিঙ্গার নেমেছেন মল্লভূমিতে। তাঁর অন্তরঙ্গ সখা পররাষ্ট্র সচীব রজার্স, যাঁর সাহায্য তিনি নিয়েছেন রাজনীতিতে ছায়ারূপে পদার্পণ-কালে, অকৃপণভাবে, তাঁকে সরিয়ে তিনি সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রখর দিবালোকে। ভিয়েনা কংগ্রেসের শক্তিসাম্য নির্মাণকালে তাঁর মানস-গুরু মেটারনিষও ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিমান অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্র-মন্ত্রী। রণাঙ্গনে নেমে কিসিঙ্গার কোন্ ইন্দ্রিয়াতীত শঙ্খধ্বনি বাজিয়েছেন, জানি নে, কোন অদৃশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বুঝি নি কিন্তু ফলস্বরূপ এ ক'দিনে কি কি ঘটলো লক্ষ্য করুন। সব কটাই কিসিংগার নীতি অনুযায়ী।

১। ইজরায়েল অকস্মাৎ আক্রমণ দ্বারা সীরিয়ার বিমান বাহিনীর এক বৃহৎ অংশ পঙ্গু করেছে পরশুদিন। সীরিয়া রীতিমত ধরাশায়ী।

২। জনাব আজীজ আহমদ অকুণ্ঠ তর্কাতীত ভাষায় বলেছেন, সর্বশেষ

যুদ্ধবন্দীকে পাকিস্তানে পাঠাও। তাদের বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা চালাতে পারবে না। উইনাইটেড নেশনে ঢোকার প্রস্তাব তার পর। চীন আছে সেখানে পুরো মদত দিতে—আমাকে। কোথায় গেল উভয়পক্ষের সমাসনে বসে আলোচনার সমঝোতাটা? এই সুর-পরিবর্তন বিশ্বরাজনীতিতে ভয়ঙ্কর কিছু নয়, কিন্তু বাংলাদেশ এবং পরোক্ষভাবে আফগানিস্তানের পক্ষে জব্বর গুরুত্ব ধরে।

৩। সদর দাউদ মার্কিনের চেলা না হয়েও কিসিংগারের অদৃশ্য ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি পাঠিয়েছেন আগা মুহম্মদ নঈমকে কমরেড ব্রেজনেভের কাছে। কি বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় নি। দাউদ যে আজীজের কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন তাই নয়, কিসিংগার যে পাকিস্তানকে সাহায্য করবেন (দাউদ জানেন, সে সাহায্য গোপনে সেরা সেরা অস্ত্রশস্ত্রের রূপ নেবে) সেটা কিসিংগার সিনেটের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। নিক্সনাদির দৃঢ় বিশ্বাস রুশের সাহায্য নিয়ে দাউদ 'কু' সমাপন করেছেন, ব্রিটিশ বলে অসম্ভব নয়, তবে রুশ যে আগের থেকেই কু'র খবর জানতো সেটা সন্দেহাতীত।

৪। সবচেয়ে মারাত্মক চিলি রাষ্ট্রের কু। নিউইয়র্ক টাইমস বলেছে, চিলির কু'র আগের দিনই যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাটির খবর জানতো। মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সিনেটের সামনে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ঝটপট তার দেমাঁতি (প্রতিবাদ) প্রকাশ করেছেন ও মৃতের স্মরণে সরকারী ব্লটিং পেপার দিয়ে আড়াই ফোঁটা কুম্ভীরাশ্রু শুনিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ংক্রিয় গোপন টেপ-রেকর্ডের জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে থাকলে সে টেপ মহাফিজখানায় সযত্নে রাখা হয়েছে কি না, সুপ্রীম কোর্ট গোঁ ধরে সেটা চেয়ে বসলে সদর নিক্সন সেটা দেবেন কিনা, তা এখনো প্রকাশ পায়নি।

এতগুলো দিগ্বিজয় কি দৈবযোগে, গ্রহ-নক্ষত্রের কেরামতিতে ঘটলো? এর সঙ্গে বিজড়িত আছে আরো তিনটি ঘটনা। (১) যে আদালতে ওয়াটার-গেট কমিটির পক্ষ থেকে নিক্সনের উপর হুকুমজারি চাইছে, তিনি যেন তদন্ত সম্পর্কিত টেপগুলো কমিটিকে দিয়ে দেন, সে আদালত সরাসরি রায় না দিয়ে একটি সুলেহ প্রস্তাব করেছেন। অনেকে মনে করেন, নিক্সন-বৈরী-ভাব যেভাবে দ্রুত কমে যাচ্ছে তাতে করে আদালত দেশের বিরাটতর স্বার্থের খাতিরে এটা করেছেন। কিন্তু নিক্সন গরম। পূর্বেই একাধিকবার শুনিয়েছি, কি কেরামতির বদৌলত এ সব ঘটছে? এখন শুধোই হুজুরের আকস্মিক এ

গরমাইয়ের অর্থটা কি ? তিনি আদালতকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু এতে করে আমার "প্রশাসনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধিকার"—খুদ-মুখতারী—ক্ষুন্ন হবে না তো ? অর্থাৎ ভবিষ্যতে ফের অন্য কিছু চেয়ে বসলে আমাকে বিনা ওজর-আপত্তো সুড়-সুড় করে কুল্লে চীজ ঢেলে দিতে হবে না তো ? আদালত সঙ্গে সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছেন, "আরে না, না, না।" এ সব প্রশ্ন, হঠাৎ এই মধুর মধুর মোলায়েমীটা আদালতের খাসলতে এল কোথেকে ? আদালতের এহেন গুংজাইশ প্রচেষ্টা যে বড্ডই অভিনব ঠেকছে ! আমরাও সুলেহ্ চাই, কিন্তু এতখানি আক্রা দরে ?

(২) আরভিন তদন্ত কমিটি নিয়েছিলেন ছুটি—১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত। হঠাৎ খবর এল, আরভিন মেম্বারদের জানিয়েছেন, ছুটি বাতিল, কমিটি বসবে ২৪শে সেপ্টেম্বর। কেন ? অনেকেই বলছেন, যেভাবে ঝড়ের বেগে হাওয়া পাল্টাচ্ছে, তার থেকে অনুমান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, যে মোতাবেক ১৫ই অক্টোবরতক আরভিন কমিটি ছুটি উপভোগ করে ঐদিন কমিটি ঘরে এলে হয় তো দেখবেন, দরওয়াজা বন্ধ, পাইক-বরকন্দাজ হাওয়া, আসামী-ফরিয়াদি গায়েব।

(৩) অবস্থার অধঃপতন দেখে স্বয়ং কেনেডী আসরে নেমেছেন।

মানতেই হবে, বাবাজীবন কিসিংগারের পেটে এস্তের এলেম গিজ গিজ করছে।

কি ভয় দেখালেন তিনি ? তার সারাংশ এইমাত্র শুনলুম, বেতারে। অবশ্য তিনি জিভ কেটে বলবেন, তওবা, তওবা। খাকসার ইহুদীর পোলাভা দেখাবে ভয়—মহাপরাক্রান্ত আরভিন কমিটি, কংগ্রেস সিনেটকে ! তওবা, তওবা !···অতএব বারান্তরে।

প্রেমালাপ বনাম বৈদ্য-বিমান

পাড়া-পড়শী কারো কাছ থেকে এক খণ্ড মার্কিন সংবিধান লিপি যোগাড় করতে পারবো এমনতরো বাতুলাশা আমরা করি না। আর, যোগাড় হলে লাভটাই বা কি ? ওয়াটারগেটের টেপরেকর্ড প্রেসিডেন্ট নিক্সন আদালতের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য কি না, সংবিধান এ-সমস্যায় কি নির্দেশ দেয়, এই নিয়েই তো যত মাথা ফাটাফাটি। তদন্ত কমিটি বলছেন, দিতে বাধ্য। নিক্সন বলছেন, না। তুলনামূলক যুক্তি দিয়ে বলছেন, প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগত কর্ম-

চারীদের সঙ্গে যে সলা-পরামর্শ করেন সেগুলো পূতপবিত্র মুকদ্দস। যেমন মক্কেল এবং উকীলে যেসব অন্তরঙ্গ আলোচনা হয়, স্বামী-স্ত্রীতে নিভৃতে যে গুফতো-গো হয় সেগুলো পবিত্র। অর্থাৎ কোনো আদালতই সেগুলো মোক্ষম হুকুম দ্বারা সংগ্রহ করতে পারেন না, জজ এগুলো একা একা গোপনে পড়তেও পারেন না, প্রকাশ্য আদালতে সর্বজন সমক্ষে ফাঁস করে দেওয়ার তো কথাই ওঠে না। জনৈক টীকাকার উত্তরে বলেন, যে-দুটো উদাহরণ নিক্সন পেশ করলেন সে-দুটো যদি আইনত মেনে নেওয়া হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উদাহরণ অতি অবশ্যই মানতে হবে, এবং ঘড়িয়াল নিক্সন সে উদাহরণটা চেপে গেলেন কেন?—ডাক্তারে রোগীতে যে গোপন আলাপ হয় সেটাও সেক্রেড। প্লাতোর চেয়ে বয়সে বড়, ইয়োরোপে যিনি "চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক" রূপে পরিচিত সেই গ্রীক বৈদ্যরাজ হিপপো-ক্রাতেস তাঁর শিষ্যদের দিয়ে শপথ করিয়ে নিতেন "আমি যা কিছু সর্বাপেক্ষা পূত-পবিত্র (সেক্রেড) বলে স্বীকার করি, তাদের নামে শ্রদ্ধাভক্তিসহ (সলেমলি) শপথ করছি, আমি চিকিৎসাকর্ম নিষ্ঠাসহ সমাপন করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি"·········এস্থলে একের পর এক ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য সম্বন্ধে শপথ নেওয়ার পর সর্বশেষে শপথ করতে হত—"রোগী এবং তার সংশ্লিষ্ট জন সম্বন্ধে আমি যা-কিছু দেখতে পাবো, শুনতে পাবো, যেগুলো সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা অনুচিত সেগুলো আমি অলঙ্ঘ্য গোপন রূপে রক্ষা করবো (ইনভায়োলেবলি সীক্রেট)।" ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের উপমহাদেশেও ডাক্তারদের সনদ নেওয়ার সময় এই কসম নিতে হত। এখনো কোনো কোনো বৃদ্ধ চিকিৎসকের চেম্বারে এই শপথলিপি ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় দেখা যায়। আজকের দিনে······যাক, অপ্রিয় কথা।

নিক্সনের উত্তরে যে টীকাকার রোগীর গোপন কথার পবিত্রতা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন তিনি খুব সম্ভব আড়াই হাজার বছরের পুরনো সর্ববিশ্ব-সম্মানিত এ শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার দোহাই দেবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করেন নি। আসল কথা, নিক্সনের দুশমন জনৈক সিনেটরকে ঘায়েল করার জন্য হোয়াইট হাউস কর্তৃক সেই সিনেটরের চিকিৎসকের দফতর থেকে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের গোপন আলাপচারির রেকর্ড চুরি করানো হয়—হুবহু যে-কায়দায় ওয়াটারগেট থেকে দলিল-দস্তাবেজ পেশাদারী চোর মারফৎ চুরি করানো হয়।

নিক্সনের বিবৃতি যিনি তৈরী করে দেন তিনি নিশ্চয়ই আস্ত একটি গর্দভ। উকিল-মক্কেল, স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তার পবিত্রতা নিয়ে উদাহরণ দেবার কীই

বা ছিল প্রয়োজন ? করলেই যে রোগী-বৈদ্যের পবিত্রতর কথোপকথন উদাহরণ আপনার থেকেই এসে যাবে, সেটা এক লহমার তরেও তার মাথায় খেলে নি ? তাজ্জব ! এবং সেই পবিত্রতা ভঙ্গ করেছেন নিক্সনের আপন খাস কর্মচারিগণ !

স্কুল-বয় কিসিংগারের ভাইভা

আমি কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিন সংবিধান-লিপির তালাশ করছিলুম। কয়েকদিন ধরে ডঃ কিসিংগারকে মার্কিন সিনেটের একটা বিশেষ কমিটির সামনে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মার্কিন ফরেন-পলিসি নিয়ে হরেক রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। যেন ভাইভা পরীক্ষা। ইতিমধ্যে এক মার্কিন বেতার-কেন্দ্র বললে, দু'জন মেম্বর নাকি বলেছেন, তাঁরা কিসিংগারকে ফরেন মিনি-স্টারের নোকরিটা দিতে চান না। ব্যাপারটা তবে কি ? আমরা তো জান-তুম, গণতন্ত্র-শাসিত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী বা সক্রিয় প্রেসিডেণ্ট তাঁর পছন্দসই মন্ত্রী নিয়োগ করেন, খুশীমত ডিসমিস করেন গণ-পরিষদ, এমন কি আপন মন্ত্রী-মণ্ডলী-কেবিনেটের কোনো তোয়াক্কা না ধরে। তাই ধরে নিচ্ছি, প্রাগুক্ত কমিটি যদি কিসিংগারকে গোল্লা দিয়ে না পাশ করে দেন, তবে নিক্সন ভেটো মেরে না-পাশিটা বাতিল করে দিতে পারেন। কিংবা এটাও সম্ভব যে, কিসিংগার যেহেতু জাত-মার্কিন (এমেরিকান সিটিজেন বাই বার্থ) নন, ষোল বছর বয়সে স্টেট্‌সে এসে ডমিসাইল্ড নাগরিকত্ব পান, তাই সুদ্ধমাত্র এ ধরনের উমেদারকেই হয়তো তাদের নির্ভেজাল "মার্কিনত্ব" প্রমাণ করতে হয়। শুনেছি, জাত-ইতালিয়ান ভিন্ন অন্য কেউ হোলি পোপ হতে পারেন না, তথা ভিন-ধর্ম থেকে দীক্ষিত খৃষ্টান পাদ্রী সমাজে বিশেষ একটা পদের (যেমন বিশপের) উপরে যেতে পারেন না। আমার এ-খবর যদি ভুল হয়, ক্যাথলিক সমাজ দয়া করে অপরাধ নেবেন না। তা সে যাই হোক, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত দেশের মুরুব্বীস্থানীয় ফরেন মিনিস্টার একটা স্কুল বয়ের মত ভাইভা দিচ্ছেন এ তসবীরটা আমার কাছে কেমন যেন খাপছাড়া বদখৎ মনে হয়।

তাজহীন আগ্রা ?

এরই সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটা খবর আমাকে আরো বেকুব বানিয়ে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ভুট্টো স্টেটসে মিঃ নিক্সনের সঙ্গে দু'বার দেখা করবেন, উনোতে বক্তৃতা দেবেন, নেশনাল প্রেস ক্লাবেও তাই— এবং অবশ্যই সেখানে নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দেবেন, এমন কি নিক্সনের বিরুদ্ধবাদী নেতাগণ যথা হামফ্রি, ফুলব্রাইট এবং কেনেডীর সঙ্গে মোলাকাত করবেন। সিনেটের ফরেন রিলেশন কমিটির মেম্বর এঁদের দু'জন। কিন্তু হবু ফরেন মিনিস্টার, কার্যত সে পদে বহাল—ডঃ কিসিংগারের নাম কই ? মিঃ ভুট্টো নিশ্চয়ই তাঁর ন'মাস ধরে কপচানো বুলি ভুলে গিয়ে ওয়াটার-গেটের মত ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে নিক্সনের সঙ্গে দু'দিন ধরে রসালাপ করবেন না। এস্তেক সিনেটের ফরেন কমিটির সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু খুদে ফরেন মিনিস্টার কিসিংগারের সঙ্গে দেখা করবেন বলে কোনো উল্লেখ নেই, এটা কি করে সম্ভবপর হয় ? ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইয়েহিয়াকে মদদ দেবার জন্য প্রতিদিন জরুরী মিটিংএ সভাপতিত্ব করেছেন যে কিসিংগার! চীনে যে লোমহর্ষক মুলাকাত হল মাও এবং নিক্সনে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান আলোচনার সময় আর দু'জন মাত্র লোক—চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এবং কিসিংগার। মার্কিন ফরেন মিনিস্টার রজার্স নিতান্তই বাহাররূপে দলের সঙ্গে ছিলেন বটে কিন্তু সে সভায় তাঁকে ডাকা হয় নি। মাও যখন নিক্সনকে তাঁর আপন বাড়ীতে দাওয়াত করলেন তখন দাওয়াত পেলেন কিসিংগার—কোথায় রজার্স ? চীনের প্রাচীর দেখবার জন্য নিক্সন গেলেন সদলবলে ; পিকিংএ রয়ে গেলের কিসিংগার, চুর সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তায় (হয়তো গোপন চুক্তির !) রূপ-রেখা দেবার জন্য ! চু বলেছেন, "ঐ একটা লোক যার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা যায়।" সর্বপ্রথম মোলাকাতের সময় পাছে কোন ফজুল প্রটো-কলবশতঃ কিসিংগার উপস্থিত না থাকেন, তাই মাও আগে-ভাগেই নিক্সনকে জানিয়ে রেখেছিলেন কিসিংগার অতি অবশ্যই যেন সে মোলাকাতে হাজির থাকেন। বিশ্বজন সে সময়েই একেবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, চীন-মার্কিন আঁতাতের একমাত্র ঘটক শ্রীযুক্ত কিসিংগার। অনেকেরই বিশ্বাস, তাঁর সম্মতি ছাড়া নিক্সন নিশ্চয়ই ভুট্টোকে গদিতে বসাতেন না। এবং একটা তেতো হক বাৎ যদি মেনে নেওয়া হয় যে, ইয়েহিয়াকে ব্যাক করে নিক্সন মার খান নি, কিল হজম করেছেন কিসিংগার, তবে এটাও খুবই স্বাভাবিক যে, কিসিংগার

পুরো মদদ দেবেন মিঃ ভুট্টোকে, সে পরাজয়ের কালিমা যতখানি পারেন তাঁকে দিয়ে মোছাবার জন্য। একটু শঙ্কাও যে নেই, বলবে কে?—ইহুদী সন্তান কিসিংগার দাদ নেবার তালে থাকবে না, এ ভরসাই বা দেবে কে? সেই কিসিংগারের নাম নেই, ভুট্টো যাঁদের দর্শন করতে যাচ্ছেন ওয়াশিংটনে, তার ফিরিস্তিতে? তার চেয়ে পাঠক বললেই পারেন, "আগ্রা যাবো নামজাদা সব এমারত দেখতে"—ফিরিস্তিতে দেখি, তাজমহলের নাম নেই। হল না। বরঞ্চ বলি, সর্ব ফিল্ম বাবদে জউরী গুনিন 'ঘটি' বললে, "চললুম ঢাকা, দেখবো সরেস সরেস ফিল্ম।" তার নোট-বুকে তাকিয়ে দেখি, চিত্তহারিণী "তারকা" কবরী দেবী যে সব ফিল্ম ধন্য করেছেন তার একটারও নাম নেই বেকুবের ফিরিস্তিতে!...ভুট্টো কিসিংগারে দেখা হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার উল্লেখ নেই, কেন? তবে কি কিসিংগারের এখন কোনো ধরনের রাজনৈতিক ইদ্দত পিরিয়ড যাচ্ছে?

অসাধারণ মেটারনিষ বিরাট কংগ্রেসে যে রকম আপন ব্যক্তিত্বের ম্যাজিক বাঁশী বাঁজিয়ে দশটা নেশনকে নাচাতে পারতেন, ঠিক তেমনি বল-রূমে নিজে নাচতে পারতেন অপূর্ব লাস্য-লালিত্যসহ সমস্ত রাত। তাঁর স্মরণে গদগদ কণ্ঠে কিসিংগার বলেছেন, "কি কেবিনেটে, কি লেডিজদের অন্তরঙ্গ অভ্যর্থনা কক্ষে—সাঁলোতে—তাঁর চলন-বৈঠন, অনায়াস আচরণ ছিল প্রকৃত রোম্যাণ্টিকের মত। কেবিনেট সাঁলোর সম্মেলন করতে পেরেছিলেন তিনিই। অধ্যাপক কিসিংগার আজকের দিনে গুমড়োমুখো পলিটিশিয়ানদের দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতেন, কত না দূরে অন্তহীন সুদূরে চলে এসেছে এরা, সেই গৌরব এবং মাধুর্যময় যুগ থেকে—রাজনীতিকলা আর জীবন-চালনা-কলা দুটোর সমন্বয় করতে জানে না এরা। আজ সবাই বলছে কিসিংগার এ সমন্বয় করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। আবার মেটারনিষের মতই কিসিংগার বিশ্বাস করেন, রাজনীতি একটা আর্ট—কলা-বিশেষ। সে আর্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর নির্মিত হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু আদর্শবাদের সঙ্গে তার কানাকড়িরও সম্পর্ক নেই। পৃথিবী দূরে থাক, মানুষের ভিতরও কোনো পরিবর্তন আনার সংকল্প কিসিংগারের পরিকল্পনাতে নেই। তাঁর কাছে ন্যায়-অন্যায় বলেও কিছুই নেই। তিনি চান, উপস্থিত পৃথিবীতে যে সব রাষ্ট্রবল আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এমন একটা সামঞ্জস্যে নিয়ে আসা (সে নিয়ন্ত্রণ করার সময় কোনো আদর্শবাদের প্রশ্নই ওঠে না; নিয়ন্ত্রণটা সাধু নেবে, না অসাধু সে নির্বাচনে সম্পূর্ণ সে নিরপেক্ষ) যাতে করে রাষ্ট্রবলগুলো এমনভাবে প্র পে

গ্রুপে বিভক্ত হয় যে যুদ্ধজনিত অশান্তির সৃষ্টি না হতে পারে।

কে জানে, তবে কিসিংগার কখনো মুখ ফুটে বলেন নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে তিনি হয়তো আখেরী বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধকরূপে ধরে নিয়েছিলেন এবং সেটাকে ইয়েহিয়ার দমনপ্রচেষ্টা তিনি নেকনজরে দেখেছিলেন। ঠিক ঐ কারণেই, বিশ্বের ছোট বড় সব শক্তিকে গ্রুপে গ্রুপে ফেলার জন্য বেলুচ-পাঠানের অটোনমি তিনি পছন্দ করবেন না। তাঁর শখের ভারসাম্যের জন্য তাঁর হাতে মেলা অস্ত্রশস্ত্র আছে।

কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রই কি শেষ সত্য?

গুজোরব তথা তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব

গুজোরব প্রতিষ্ঠানটির রাজধানী কোথায়? ঐয্—যা! বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, বিশাধিক বৎসর ধরে দুই বাংলায় পুস্তক পত্র-পত্রিকার আদান-প্রদান প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে দুই বাংলার লেখার ধরন, বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ, বাংলাতে একদা সুপ্রচলিত কিন্তু বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অব্যবহৃত 'যাবনিক' শব্দের পুনর্জীবন লাভ, নতুন নতুন শব্দনির্মাণ ইত্যাদি দুই বাংলায়, স্বভাবতই, এক পথ ধরে চলে নি। যে গুজোরব শব্দ দিয়ে লেখাটি আরম্ভ করেছি সেটা খুব বেশী দিনের পুরনো নয়। গুজোব-এর 'গুজো' আর জনরবের 'রব'—একুনে গুজোরব।······ইংরেজীতেও এ ধরনের বেশ কিছু শব্দ ইদানীং তৈরী হয়েছে। স্মগ শব্দটি এক্কেবারে চ্যাংড়া না হলেও খানদানীত্ব পেতে অর্থাৎ মোলায়েম প্রেমের কবিতায়, ফুল-ডোরে বাঁধা ঝুলনায়, আসন পেতে এখনো তার সময় লাগবে। লণ্ডনের কুয়াশায় পথহারা খাস লণ্ডনবাসীই ল্যাম্প-পোস্টটাকে পুলিশম্যান ভেবে তার কাছে পথের সন্ধান নেয়, খুদ পুলিশম্যান আপন বীট-এ পথ হারিয়ে কারো বাড়ীর ঘণ্টা বাজিয়ে গৃহস্থকে শুধোয়, সুমুখের রাস্তাটার নাম কি? কোনো দিন যদি বেলা তিনটে থেকে প্রায় সাতটা-আটটা অবধি কুয়াশা না কাটে তবে যাট হাজারের কাছাকাছি ডেলি-প্যাসেঞ্জার ইয়ার-দোস্তের (যদি বরাত জোরে তাদের বাড়ী খুঁজে পায়) বাড়ীতে রাত কাটায়, বেশীর ভাগ হোটেলে আশ্রয় নেয়।···তদুপরি লক্ষ লক্ষ চিমনি থেকে যে ধুঁয়ো ওঠে সেটা কুয়াশা ফুটো করে উপরের দিকে উধাও হতে পারে না বলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তৈরী হয় স্মগ। "স্মোকের" স্মআর 'ফগের' গ নিয়ে তৈরী হল স্মগ। কলকাতায়ও

স্মগ হয়, কিন্তু লণ্ডনের তুলনায় একদম রদ্দী—পানসে। ঢাকার ভেজাল বে-আইনী বিয়ারের মত। নির্জলা জল। তা সে যাক গে। কলকাতার স্মগকে বলে ধুঁয়াশা—ধুঁয়া প্লাস কুয়াশার শা মতান্তরে ধুঁয়া'র ধুঁ প্লাস কুয়াশার য়াশা। হরেদরে হাঁটু পানি। এককালে মডার্ন কবিতায় দারুণ চালু ছিল ধূসর কথাটা—জীবনটা ধূসর, প্রেমটা ধূসর, ডাস্টবিনের প'চা ইঁদুরটা ধূসর, রিকশায় চীনা গনিকাটা ধূসর, মডার্ণ কবিতার বিক্রিটা ধূসর—গয়রহ। এখন ধূসর শব্দটাই ধূসর হয়ে উপে গিয়েছে। এদানির জোর কাটতি ধুঁয়া শার। মন্ত্রীর চাকুরি দেবার ওয়াদাটা ধুঁয়াশা, মিলির প্রেম-নিবেদনটা ধুঁয়াশা, তার জিল্‌টিংটাও ধুঁয়াশা, বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টাও ধুঁয়াশা—কারণ জিঞ্জিরায় তৈরী বিষটা ছিল ভেজালের ধুঁয়াশায় ভর্তি।

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় গুজোরব

গুজোরব জিনিসটা ধুঁয়াশা, তা সে 'মার্কিন টাইম' বা 'নিউজ উইক' পত্রিকায় ধোপদুরুস্ত কেতা-মাফিকই বেরুক, কিংবা কাবুলের বাজারে, চা-খানাতে "গপ" রূপে দুই পাগড়ি পাশাপাশি এসে ফিসফিসিয়েই বেরুক। এই দেখুন না, নিদেন দিন পাঁচ হবে, সম্ভ্রান্ত মার্কিনী একখানা দৈনিক একটা চিড়িয়া উড়িয়ে দিল, ভাইসপ্রেসিডেণ্ট এ্যাগনো হপ্তা খানেকের ভিতর নোকরি ইস্তিফা দেবেন; তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ রিশওয়াদ খাওয়ার মোকদ্দমা উঠবে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই লেগে গেল ধুন্দুমার। দক্ষিণ আমেরিকার কুইটো বেতার থেকে শুরু করে দুনিয়ার হেন কেন্দ্র নেই যে সেটা নিয়ে লুফোলুফি করছে না। রাত দু'টার সময় স্টকহলম (মাফ করবেন, আমি কিসিংগারি কায়দায় ইংরেজের অনুকরণে স্টকহোম লিখতে পারবো না!) খুললাম, তাদের ইলেকশনের শেষ ফলাফল জানবার তরে,—তারাও গেণ্ডেরী খেলছে ঐ এ্যাগনোকে নিয়ে। বৃন্দাবনে গোপীরা একদা যেরকম বলতেন, "কানু বিনে গীত নেই!" ওদিকে খুদ এ্যাগনো চুপ, নিষ্কন খামুশ। যেন "পাড়াপড়শির ঘুম নেই, বরের খোঁজ নেই।"

কাবুলী কায়দা

কাবুল-বাজার যে "গপ"-এর চিড়িয়া ছাড়ে সেটা পাকড়ানো সহজ কর্ম নয়। কারণ, সেটা সরকারের কানে পৌঁছলে তার ডিরেক্টর চিড়িয়া ওড়ানেওলার সন্ধানে চর লাগান। অতএব কাবুলের "বাজার-গপ" শোনবার তরে শাস্ত্রাধিকার চাই। মার্কিন তো পাত্তাই পাবে না, আর আজকের দিনের ইংরেজ সাংবাদিক অর্থাভাবে ভকে উঠি উঠি করছেন। রুশ পায় সরকারী সংবাদ, খাস প্যারা দোস্তই আউওয়াল হিসাবে সক্কলের পয়লা। তাই বাজার-গপের হিস্সেও সে খানিকটে পায়। তদুপরি তার আরেকটা দোসরা জরিয়াও আছে। সরদার দাউদের যে একটা গোপন মন্ত্রণাসভা থাকবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সে সভার সভ্য, ষোল থেকে আঠাশ, ক'জন—সে বাবদে কাবুল বাজারও দাড়ি চুলকোয়, পাগড়ির ন্যাজ নিয়ে দড়ি পাকায়, কিন্তু মুখে রা'টি কাড়ে না। তবে কি না, একটা সত্য কেউ বড়-একটা অস্বীকার করে না। দাউদ কু'টা যে করতে সক্ষম হয়েছেন, তার পিছনে ছিলেন বেশ এক পাল মস্কোতে ফৌজী তালিম প্রাপ্ত আফগান অফিসার।

তাঁদের যে ক'জন মন্ত্রণাসভায় হক্কতঃ আসন পেয়েছেন, তাঁরা যে আফগানিস্তানকে আখেরে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্ররূপে তৈরী হবার জন্য সংস্কার বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে চাইবেন সেটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

ছাত্র বনাম মোল্লা

প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলোতে ছাত্র-সমাজ আজ অশেষ শক্তি ধারণ করে। ছুটিতে তারা যখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে যায় তখন সেখানে সর্বত্র চালায় পলিটিক্স্। মোল্লাদের মল্লভূমি প্রধানত মসজিদের মক্তবে। তাদের সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন-দর্শন। দাউদ দেশের কুল্লে মক্তব এবং যে দু-পাঁচটা বে-সরকারী নিতান্তই জুনিয়ার মাদ্রাসা আছে সেগুলো সরকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। কাবুল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাবিদরা বেরিয়েছেন ক্ষুদ্র শহর এবং গ্রামাঞ্চলে সে-সব মক্তব মাদ্রাসা পরিদর্শন করতে ও তত্ত্ব-তথ্য সংগ্রহ করতে।

দাউদ যদি সত্যসত্যই তাঁর প্ল্যান পুরোদমে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে চান, তবে যে-সব মোল্লারা এখনো তার বিরোধিতা করেন নি তারাও যে বিগড়ে

যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। তথ্যান্বেষী যে-সব শিক্ষাবিদ সফরে বেরিয়েছেন তাঁরা সৃষ্টিছাড়া কোনো নয়া তথ্য আবিষ্কার করবেন কি? মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক নিসাব তো কাবুল শহরে বসে বসেই যোগাড় করা যায়। সেগুলোতে আছে কি? ফার্সী ভাষা শেখার কায়দা-কেতা, কুরান শরীফ পাঠ, শেখ সাদীর অতুলনীয় কবিতা এবং নামাজ শুদ্ধরূপে পড়ার জন্য দোওয়া-দরুদ। আর মাদ্রাসায় এ সবেরই অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক এবং সুকঠিন আরবী শেখাবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা। ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ফিকাহ—অতি সংক্ষিপ্ত রূপে পড়ানোর ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু প্রাতঃস্মরণীয় ইমামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ বুদ্ধিসম্মত (রেশানাল) যুক্তিতর্ক বোঝবার মত শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন ক'জন আফগান মোল্লা-মুদররিস? পড়াবার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে শিক্ষাবিদরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন, ওসব কেতাবে রাষ্ট্রদ্রোহ শেখায় এমন আছে কি সব শিক্ষা, আদেশ, ফৎওয়া। এবং হবেন নসিকে নিরাশ। ইমাম সাহেবের আমল ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগ। সে-আমলে কোন্ ফকীহ বেকার মাথা ঘামিয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহের ফৎওয়া নির্মাণ করার তরে?

বস্তুত মোল্লারা যখন কোনো কওমকে কাবুলের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন তখন তাঁরা আটঘাট বেঁধে আট গজী ফৎওয়া লিখে সেইটে তাদের সামনে উচ্চকণ্ঠে পাঠ করে ফজুল ওয়াক্ত খর্চা করেন না। মক্তব মাদ্রাসায় এমনিতেই খামোখা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বা বিদ্রোহ কোনোটাই শেখান না। লুটতরাজের জন্যই হোক, বা অন্য যে কোনো "কারণেই" হোক মোল্লারা যখন আফগানকে কাবুলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন তখন তারা নিতান্ত ফাউ স্বরূপ মক্তবের বাচ্চাদের সামনে হয়তো বা গরম গরম দু'একটি ওয়াজ ঝাড়েন। সেগুলো সম্পূর্ণ অরিজিনাল, তাঁদের আপন মস্তিষ্ক-প্রসূত ; পাঠ্য-পুস্তক বা নিসাবের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই—আজকের দিনের শহুরে ভাষায় এগুলো কমপ্লিটলি একস্ট্রা-কারিকুলার।

মোল্লাদের ঘরে বন্দুক-কামান কিছুই নেই। তৎসত্ত্বেও প্রায় দেড়শ' বছর ধরে তারা ইংরেজের পুরো-পাকা ফৌজকে কয়েকবার খেদিয়ে ঝেঁটিয়ে পেঁদিয়ে বের করে দিয়েছে আফগানিস্তান থেকে। আমান-উল্লার মত একাধিক বাদশাকেও তারা ঘায়েল করেছে অশিক্ষিত পাঠানকে উস্কে দিয়ে।

সরদার দাউদের পক্ষে আছে ছাত্ররা। কিন্তু দাউদের দেশ বাংলাদেশের মত নয়। কোথায় সন্দ্বীপ, কোথায় বরিশালের অজ পাড়াগাঁ—ওসব জায়গা

থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসে সদরে, চট্টগ্রাম, সিলেট ঢাকায়। তারাই একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল আপন আপন গ্রামে গ্রামে মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান। ধন্য তারা, জয় হোক তাদের।

কিন্তু সদর দাউদের ছাত্র সমাজ তো এখনো কাবুল, জালালাবাদ ইত্যাদি কয়েকটি নগরের খাঁটি বাসিন্দা। জনপদের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নেই। সেখানে— ?

আমাদের মনে শংকা জেগেছে। কারণ আমরা গরীব। গরীব আফগানিস্তানের তরে আমাদের দরদ আছে। সরদার দাউদের সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হোক, এই আমাদের কামনা। কিন্তু এই কি তার পন্থা ?…অবশ্য তিনি যদি রাজ্যের "রাজ্যির" মোল্লাগণকে তনখা দিয়ে সরকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন তবে অন্য কথা। কিন্তু তার তরে অত কড়ি কই ?

কু দে'তার ছুস্‌রা জুতা

ছুস্‌রা বুট দড়াম করে পড়ে নি। বিলকুল ঠাহর করতে পারি নি। আবার গোবলেট করে ফেলেছি। ফিনসে শুরু করি।

জার আমলের খানদানী ঘরের ছেলেরা কলেজ, মিলিটারি আকাদেমির ছোকরারা শেষ পাশ দিয়ে, কিংবা ফেল মারার পর কণ্টিনেণ্ট যেত আপন শিক্ষা-অশিক্ষার উপর পালিশের জেল্লাই লাগাতে। আন্দ্রেই প্যাদ্রোভিচ জমিতফ যথারীতি বার্লিন-ভিয়েনা সমাপনান্তে পৌঁছেছে ফ্লরেনসে। সেখানে চতুর্দিকে ফুলে ফুলে ছয়লাপ, কিয়াস্তি প্রভৃতি মদ্যাদি বেজায় সস্তা আর ছুঁড়িগুলোর এ্যাসন মাইরি-মাইরি চেহারা যে জানটা তর্‌-র-র তাজা হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে পান করবে, নাচবে, কত গোপন গানে গানে বলবে তোমায় কানে কানে, "সিন্নোর, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরকাল তোমার হয়েই থাকবো" কিন্তু মুশকিল, একমাত্র তোমাকেই না, আরো পাঁচজনকে ঐ একই দিব্যি দেয়। ওদের বিপদ, ওরা কাউকে কখনো "না" বলতে শেখে নি—পাড়াতে কারো কারো প্যারা নাম "বিশ্ব-তোষক"। আমাদের আন্দ্রেইকে পায় কে ? প্রতি রাত্রিই বাসর-রাত্রি—বিনা পাত্রী। একরাতে তিনটেয় হোটেলে ফিরে ছমদাম করে নেচে নেচে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে দ্রাম করে একখানা বুট ছুঁড়ে মেরেছে কাঠের পার্টিশনের উপর। সঙ্গে সঙ্গে পাশের কামরা থেকে হুঙ্কার, "হেই জংলী, অত গোলমাল করছিস কেন ? ঘুমুতে দিবি না ?" আন্দ্রেই

বড্ড লজ্জা পেল। চুপসে খাটের উপর ব'সে, বিলকুল আওয়াজমাত্র না করে, দুসরা বুটটি আস্তে আ-স-তে রেখে দিল খাটেরই উপর। তার পর অঘোরে নিদ্রা। ঘণ্টা তিনেক পর তার বেঘোর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, পার্টিশনের উপর জোর খটখটানি শুনে। পাশের কামরার লোকটা চেঁচাচ্ছে, "ওরে মাতাল, দুসরা বুটটা ছুঁড়ে মারবি কখন? আমি অপেক্ষা করছি যে। তারপর ঘুমুতে যাবো।"

আমার হয়েছে তাই। এই, মাত্র গেল রববার দিন, লিখছিলুম, দাউদ যে সব রিফর্ম শুরু করেছেন তাই নিয়ে আমার ডর-ডর করছে। দুসরা বুটটা যে কখন দড়াম করে পড়বে তারই পিতিক্ষেয় ছিলুম। হঠাৎ কাগজে দেখি, ওমা! দুসরা কু দে'-তা কবে ইতিমধ্যে চুপসে হয়ে গেছে, আমি টেরটি পর্যন্ত পাই নি। রববার দিন ভর-রাত দুনিয়ার কুল্লে বেতার ম ম করছিল, কাবুলে দ্বিতীয় কু'র বাচ্চাটিকে প্রসবালয় থেকে সরাসরি গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিংবা বলতে পারেন, কাবুলী বউয়ের গর্ভপাত হয়েছে। কাবুল প্রচার করছে, সরদার দাউদকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য কিছু ফৌজী অফিসার এবং কিছু সাধারণ নাগরিক চক্রান্ত করার সময় ধরা পড়ে যান। তাঁদের ফৌজী বিচার হবে।

এ বিষয়ে মন্তব্য করার পূর্বে "দুসরা বুটের" চুটকিলাটিতে ক্ষণতরে ফিরে যাই। গল্পটি আকছারই কাজে আসে। দোস্ত শুধোলেন, "কি হে, চাকরীটা পেলে?"

"দুসরা বুটের তরে অপেক্ষা করছি?"

??

'বুঝলে না?' চাকরীটা কে পাবে তার ডিসিশন হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়? এনাউন্‌স্‌মেন্ট হবে আজ সন্ধ্যায়। দুসরা বুট ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে কাল সন্ধ্যায়—আমি খবরটা পাব আজ সন্ধ্যায়।" এ ধরনের কারবার আমাদের জীবনে নিত্যিকার।

খাঁটি কু, না জিঞ্জিরা মার্কা?

এ জীবনে একটা তথাকথিত কুকে আমি যেন অকুস্থলে, যেন বকসিঙের রিংসাইডে বসে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সে কু' সত্য না ডাহা জোচ্চুরি এ নিয়ে এখনো তর্কাতর্কির অবসান হয় নি। ২০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলারের

হুকুমে কয়েকশ' লোককে বিনা বিচারে গুলি করে মারা হয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রোম। হিটলার যে একদিন জর্মনির নিরঙ্কুশ একনায়কত্ব লাভ করেন তার জন্যই এই রোমের আপ্রাণ পরিশ্রমকে ক্রেডিট দিতে হয় চৌদ্দ আনা। হিটলারকে যে দু'তিনটি লোক "তুমি" বলে সম্বোধন করতেন, রোম ছিলেন তাঁদেরই একজন। সেই রোম এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী সব ক'জনাকেই খতম করা হয় ২০ জুন, হিটলার সর্বনায়কত্ব পাওয়ার ঠিক দেড় বছর পর। অজুহাত হিসেবে হিটলার ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে দেশের লোককে জানালেন, এ সব পিশাচরা কু দ্বারা তাঁকে ও নাৎসি পার্টিকে সমূলে বিনাশ করতে চেয়েছিল; তিনি পূর্বাহ্নেই ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেয়ে আপন দায়িত্বে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

রোম যে কোনো প্রকারের কু'র ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেটা প্রচুর প্রপাগাণ্ডা সত্ত্বেও সে সময়ে সপ্রমাণ করা যায় নি; আজ দোষটা চৌদ্দ আনা পড়ে হিটলার, গ্যোরিঙ্গ ও হিমলারের ঘাড়ে।

এটাকে বলা হয় পার্জ—জোলাপ। আকস্মিক আগাপাস্তলা পাল্টে দিয়ে যখন স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী একটা দল ক্ষমতা লাভ করে তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মধ্যে স্বার্থে স্বার্থে লাগে সংঘাত এবং কত যে হীনতা নীচতা তখন দলের ভিতরে বাইরে বেরিয়ে পড়ে সে বাবদে আমার মত অগা আর নতুন করে বলবে কি? বিশেষত আমার লেখা পড়েন ক'জন প্রাণী! এবং একমাত্র আমার মহামূল্যবান তত্ত্বকথা ছাড়া তাঁরা অন্য কারো লেখা—এস্তেক গোপাল-ভাঁড় তক—পড়েন না, এ হেন মিথ্যা স্বীকৃতি হলে আমি এই লহমায় আমার সাদা কলমটি কালো বাজারে বিক্রি করে দেব।

চক্রান্তে চক্রান্তে যখন দলপতিকে বাধ্য হয়ে এক পক্ষ নিতে হয়, তখন বহু ক্ষেত্রেই অপর পক্ষকে খতম করা ভিন্ন ফ্যুরারের গত্যন্তর থাকে না। এ তত্ত্ব-কথাটা আমার নয়। যাঁরা শক্তির উপাসনা করেন, তাঁদের অনেকেই এ নীতিতে বিশ্বাসী। সর্ব ফ্যুরারকেই তখন স্বভাবতই বলতে হয়, ওরা দেশের দুশমন, ওদের মতলব ছিল নয়া একটা কু করে দেশের সর্বনাশ করা।...এটা বহু বৎসর ধরে একটা প্যাটার্নে পরিণত হয়েছে। স্তালিন, মুসসোলীনি সব্বাই এটার এস্তেমাল করেছেন। কেউ বেশী কেউ কম।

তাই প্রথম প্রশ্ন, সত্যই কি আফগান জঙ্গী বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনরেল আবদুর রজ্জাক, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেইওয়ান্দওয়ালা, গবর্নর, খান মুহম্মদ একটা বিপ্লব ঘটাবার তালে ছিলেন, না দাউদ তাঁর নবপ্রবর্তিত

মোল্লা-বিরোধী আইন প্রবর্তন করার ফলে নিজেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে, এবং এই তিন ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ/মোল্লাগণ/"ইসলামী রাষ্ট্র" পাকিস্তান-প্রেমীগণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। অতএব বেলা থাকতেই এদের জেলে পুরে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দিতে হবে কিংবা অল্প খর্চায় গোটা কয়েক বুলেট দিয়ে।

আসলের চেয়ে ভালো কিসিংগারী ভেজাল

পাঠক, আমার পাকা ইরাদা ছিল, কাবুলী কু—মন-গড়া হোক আর জলজ্যান্তই হোক—তার পিছনে কল-কাঠি নাড়াবার তরে পাকিস্তান, রাশা, শাহের মারফৎ আমেরিকা, কে কতখানি উৎসুক সেই নিয়ে এ লেখাটি শেষ করবো। উপরের অনুচ্ছেদ সম্প্রসারিত করতে যাওয়ার এক ফাঁকে বেতারটির কর্ণমর্দন করতেই শুনি, "মার্কিন কণ্ঠ" মার্কিনী উচ্চারণে বলছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীযুক্ত হেনরি কিসিংজারের বক্তৃতা শুনতে পাবেন। ফরেন মিনিস্টার হওয়ার পর এই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। আমি আশা করেছিলুম, আজ সোমবার, আমাদের সময়ানুযায়ী রাত দশটায় ওয়াটারগেটের মুলতুবী যে মোকদ্দমাটা ফের শুরু হওয়ার কথা, শুনবো সেটা। এ মোকদ্দমাটা যে কেন ছ সপ্তাহের ছুটি না-মঞ্জুর করে তিন সপ্তাহ এগিয়ে আনা হচ্ছে তার অল্প-বিস্তর আলোচনা আমি পূর্ববর্তী সংখ্যায় করেছিলুম। আমার আশা ছিল, সেই মোকদ্দমাটা হয়তো বা "মার্কিন কণ্ঠ" সরাসরি আদালত থেকে বেতারিত করবে, নইলে নিদেন একটা ধারা কাহিনী তো বটেই। পাঠক, বিবেচনা করুন, কোনটা বেশী রগরগে হত!

তবু মন্দের ভালো। আমি এ তাবৎ কিসিংগারী "বক্তিমে" কখনো শুনি নি। আমার প্রধান কৌতূহল: কিসিংগার জীবনের প্রথম পনেরো বছর কাটিয়েছেন জর্মনির ক্ষুদে ফ্যুর্ট শহরে। মাতৃভাষা তাঁর জর্মন এবং ঐ ক্ষুদে শহরে নিত্যি নিত্যি ইংরিজি বলার সুযোগ সুবিধে নিতান্তই নগণ্য—বস্তুত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তাঁর ডক্টরেট থিসিস লেখেন জর্মনে।

খলিফে ছেলে মশাই, খলিফে ব্যক্তি। যা ইংরিজী ছাড়লে—কার সাধ্যি বলে তাঁর মাতৃভাষা ইংরিজি নয়। শুধু কি তাই, যদিও এই চৌকশ ঘড়িয়ালটি মার্কিনত্বে খাস জাত-মার্কিনকেও টিট দিতে চান ঝালে-ঝোলে-অম্বলে, তবু ইংরিজি উচ্চারণের বেলা নাকি-সুরে, 'র' অক্ষরকে 'ড়' করে,

চিবিয়ে চিবিয়ে, টেনে টেনে "বেটাড় এ্যাণ্ড বিগাড়" মার্কিনী ইংরিজি বললেন না। রপ্ত করেছেন মার্কিন আর খাস ইংরিজির মধ্যিখানের এমন একটি উচ্চারণ যেটা দুই দেশেই কদর পাবে। শুধু লক্ষ্য করলুম তাঁর 'চ' উচ্চারণে কিঞ্চিৎ জর্মন আড় রয়ে গেছে। কারণ জর্মন ভাষায় "চ" ধ্বনিটি আদৌ নেই। কিন্তু আমার এই মিহিন সুখতা-চুনীতে পাঠক কান দেবেন না। মোদ্দা কথা: আমি অন্য কোন জর্মনকে এ হেন উৎকৃষ্ট ইংরিজি বলতে শুনি নি।

আর বক্তৃতার বিষয়বস্তু? সেটা বারান্তরে হবে। উপস্থিত তাঁর একটি আজব বাৎ শোনাই। তিনি বললেন, ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নতির দিকে। খাস ঢাকায় যদি এই বচনামৃতটি ঝাড়া হত তা হলে ডাইনে বাঁয়ে চটসে তাকিয়ে নিয়ে বলতুম "আস্তে কয়েন কত্তা, ঘোরায় হাসবো।"

পরলোকগত বাদাম প্যাঁচ

বহুকাল গেছে কেটে। প্যাঁচটাও গেছে উঠে। অতএব সে প্যাঁচের টেকনিক্যাল নামটাও যে ঘুড়িয়ালারা ভুলে যাবে তাতে আর তাজ্জব মানার কি আছে? সে আমলে কলকাতায় বসন্তের আকাশ ছেয়ে যেত কত না চিত্র-বিচিত্র ঘুড়িতে। কিন্তু বাচ্চাদের মাংজাহীন গুড্ডির সঙ্গে প্যাচ লাগানোটা আমরা রীতিমত ইতরতা বলে মনে করতুম। উপরের আকাশে চলত এ-পাড়া ও-পাড়ার ঝানুদের ভিতর উপর-প্যাঁচ, নীচের প্যাঁচ, ঢিলের প্যাঁচ, সুতো ফুরিয়ে গেলে টানের প্যাঁচ, এ প্যাঁচটা কিন্তু অনেকেই 'ফাউল' বলে বিবেচনা করতেন —চলত অনেক রকমের বিমান-যুদ্ধ। এমন সময় অতিশয় কালে-কস্মিনে ঝানুদের গুরুকুলের কোনো এক ঝাণ্ডু চড় চড় করে চড়াতেন, এ-পাড়া ও-পাড়ার কুল্লে ঘুড়ির উপরের স্তরে, তাঁর অতি গরীবী চেহারার সাদামাটা ঘুড়িখানা। সেখানে খাওয়াতেন ঘুড়িটাকে একটা গুত্তা বা মুণ্ডা। সমুচা দখিনা আসমান ঝেঁটিয়ে তাঁর ঘুড়িটা প্যাচে জোড়া ডবল ঘুড়ি, সিঙ্গিল ঘুড়ি সব কটার সুতো জড়িয়ে নিয়ে, দোতলার ছাত ছুঁই ছুঁই করে সোঁ সোঁ করে উঠত ফের স্বর্গপানে "হাগ'র দিগে"। ওঠার সময় একটা একটা করে কুল্লে ঘুড়ি যেত কেটে—যেসব ঘুড়ি আপোসে প্যাঁচ খেলছিল তারাও জোড়ায় জোড়ায় হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেতে খেতে হয়ে যেত হাওয়া। যদ্দুর মনে পড়ে, এটাকে বলতো "বাদাম প্যাঁচ"—নৌকোর বাদাম পালের সঙ্গে হয়তো

কোনো মিল আছে।

আজ কোথায় সে গুনিন, যিনি ভিন্ন বাদাম-এর খেল দেখাবেন? আকাশ বাগে তাকিয়ে দেখুন, বেশুমার কত না চিড়িয়া।

দিশী ঘুড়ি

আমরা "নিকট প্রাচ্যের" নিরীহ প্রাণী। আমাদের কারবার ইরান, আফগান, পাক-ভারত নিয়ে। (১) রাজা দাউদ আপন দেশের জনগণের মন কতখানি পেয়েছেন সেটা বাতলাবে কে'? দুসরা কূ' আসছে না কি? ওদিকে বিদ্রোহী পাক-বেলুচ-পাঠান তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। (২) ভুট্টো গেলেন, অগম অভিসারে—ইয়াংকি সাগর পারে, লাঠি-শড়কি, রামদা-ঝাঁটার সন্ধানে, (৩) শাহ যেন পস্তাচ্ছেন, ভাবছেন -মার্কিন না রুশ, রুশ না মার্কিন, শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী, কারে রাখি কারে ফেলি। (৪) মেঘমল্লারে সারাদিন-মান, শুনি ঝর্ণার গান, মাফ করবেন, শুনি লারকানাগান—বেচারী গুরুজী (কলকাতা-গামীদের বলে রাখি, হোথায় শিখ মাত্রকেই 'সর্দারজী' না বলে 'গুরুজী' সম্বোধন করলে তাদের মেহেরবাণী পাবেন বেশী) স্বরণ সিং মিঃ ভুট্টোর লাগাতার ভারতের শিকায়েৎ-জারী-মর্সীয়ার গান সুবো-শ্যাম শোনেন আর উত্তর প্রতিবাদ দেমাঁতি লিখতে লিখতে তাঁর জানটা পানি। বস্তুত আমি ২১।১২।৭১-এর ডিসেম্বরেই গুরুগম্ভীর প্রস্তাব করেছিলুম যে, শুধুমাত্র ভারত নিয়ে মিঃ ভুট্টোর কটু-কাটব্য তেরি-মেরির উত্তর দেবার তরে দিল্লীর ফরেন আপিস যেন একটা আলাদা দফতর খোলে। নইলে বেচারী স্বরণ সিং ফুর্সৎ পাবেন কোথায়, তিনি যে ফরেন মিনিস্টার, কটুকাটব্য, মিথ্যা ভাষণের দেমাতি প্রদান ভিন্ন দু'একটা গঠনমূলক কাজও তিনি করে থাকেন, সেটা হাতে-নাতে দেখিয়ে দেবার? এই পররাষ্ট্র-মন্ত্রী গুরু স্বরণ সিং—ঢাকায় তিনি এসেছেন ক'বার? তাঁর সম্মানিত ধর্মের একটি মহৎ শিখ-তীর্থও তো এখানে। আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিমত, তিনি তাঁর তীর্থদর্শনে ঢাকায় আরো ঘন ঘন এলে উভয় দেশেরই মঙ্গল হত, ভুল বোঝাবুঝি কমতো। পাঠক, তাই কিন্তু ঠাউরাবেন না, জনাব হাকসর চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করছেন। সম্ভ্রান্ত হাকসর গোষ্ঠীকে দিল্লী ইলাহাবাদে কে না চেনে—আমার মত নগণ্য ব্যক্তিও সে-পরিবারে মোগলাই বহ্বান্ন ভক্ষণকালে বিস্তর ফার্সী, উর্দু কাব্যরস উপভোগ করেছে। মাননীয় সম্পাদক, পাঠকমণ্ডলী যদি অপরাধ না নেন, তবে বলি,

আমার মনে হয় জনাব হাকসরের মত সর্বার্থে ভদ্রলোকের পলিটিকস ত্যাগ করাই ভালো। তা সে যাকগে ; ভারত, বাংলাদেশ, গুরুজী, জনাব হাকসরকে 'রিফর্ম' করার ভার আল্লাহ্‌তায়ালা আমার স্কন্ধে সমর্পণ করেন নি—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

তিন না চার

এই যে চার দফে ইরান থেকে বাংলাদেশের নিত্যদিনের পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ঘটনার ফিরিস্তি দিলুম, তার সঙ্গে যোগ দিতে হয়, তিন মহাশক্তির বহুরূপী কার্যকলাপ—চীন, রুশ আর মার্কিন দেশের নয়া নয়া খেল। বিশেষ করে তৃতীয়টির। কারণ বহু বৎসর ধরে মার্কিনরা জাপানকে বার বার বলেছে, "আমরা প্রাচ্যের পুলিশম্যান, আর তোমরা স্বভাবতই, অর্থাৎ নৈসর্গিক পদ্ধতিতেই আমাদের পয়লা নম্বরী দোস্ত।" অবশ্য এই মার্কিনী পুলিশম্যানের টহল মারার কায়দা বড়ই আজব। আর পাঁচটা দেশে গেরস্ত-জন ট্যাকসো দেয়, সে টাকায় লাঠি-সড়কি, দরকার হলে বন্দুক, পিস্তল কিনে পুলিশকে দেওয়া হয়। মার্কিন পুলিশ কিন্তু উল্‌টে গেরস্ত ইরান, পাকিস্তান গয়রহকে হুদো হুদো বন্দুক-কামান দেয়, 'বেয়াড়া' পাড়া-পড়শীকে ঠ্যাঙাবার জন্য। নিজের শরীরটা যতখানি পারে বাঁচিয়ে রাখে। তাই-না মৌলানা সা'দীর পূর্ববঙ্গীয় ভ্রাতা গেয়েছেন :

> কত কেরামতি জানোরে বান্দা
> কত কেরামতি জানো,
> শুকনায় বইস্যারে বান্দা
> পানির মাছ টানো।

"সব ইহুদী হো জায়গা"

এই তিন শক্তির বাইরে আরেকটি শক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে বহু বহু বৎসর ধরে সরাসরি এবং প্রয়োজন হলে মার্কিন সরকারকে দিয়ে আপন কাজ গুছিয়ে নিয়েছে এবং—জানেন জীহোভা—আরো কত যুগ ধরে তাদের বিচরণভূমিতে দাবড়ে বেড়াবে তারা, কিন্তু অতিশয় সঙ্গোপনে। পাঠকের স্মরণে আসতে পারে, ১৯৭১ বসন্তে যখন শেখ (ইয়েহিয়া) ভুট্টোতে আলাপ-আলোচনা

হচ্ছিল তখন মিঃ ভুট্টো ম্যাজিশিয়নের মত আচানক তাঁর হ্যাট থেকে একটি তিসরা চিড়িয়া বের করেছিলেন। তার পূর্বে তিনি সুবো শাম জপতেন 'আমি আছি ভুট্টো, আর তুমি আছ শেখ।' হঠাৎ বলে বসলেন 'আর আছে ঐ তিসরা চিড়িয়া, দি আর্মি।" যারা জুন্তার কেচ্ছা জানতো না, তারা তো পড়ল আসমান থেকে।...আমার বক্তব্য—অকস্মাৎ এই যে চতুর্থ শক্তি আমদানী করলুম সেটা কিন্তু ঐ আপস্টার্ট অপদার্থ গুলাম মুহম্মদ ইসকান্দার মির্জার গাফিলীর ছাওয়াল মিলিটারি জুণ্টা নয়। এর ইতিহাস অতি দীর্ঘ, ইনি বিশ্ব-ইহুদী শক্তি, কিন্তু আসলে এনার তাগদ বাড়লো যেমন যেমন নিগ্রো দাসদের রক্ত শুষে, রেড-ইণ্ডিয়ানদের কতল করে, মার্কিন-ইয়াংকির ন্যাজ মোটা হতে লাগলো, ব্লাংকো খুলিটা বদবো-দার গ্যাসে ভর্তি হতে লাগলো। মার্কিনী ইহুদীদের লুক্কায়িত শক্তির বয়ান দেবার মত শক্তি ইহ-সংসারে কারো নেই। ইজরায়েল রাষ্ট্র নির্মাণের সময় থেকে দু' পাঁচজন লোক এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত নাম-করার মত কোনো আমেরিকান তাদের গোপন বিষ নিয়ে কথা পেড়ে সেটা ফাঁস করে দেবার মত হিম্মত দেখাতে পারেননি। সত্যি মিথ্যে জানিনে, আমাকে এক মার্কিনই বলেন, এ শতাব্দীতে কোনো মহাপ্রভুই ইহুদীদের চটিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন নি। কিন্তু এ সত্যটা জানি, ক্ষুদ্র মাইনরিটি ইহুদীদের দাপটে যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাষ্ট্রে "মার্চেণ্ট অব ভেনিস" প্রকাশ্যে মঞ্চস্থ করলে সেটা বে-আইনী কর্ম, ফলং—শ্রীঘরবাস! অবশ্য ইহুদী শাইলক চরিত্র বাদ দিয়ে নাটকটি অভিনয় করলে হয়তো বা আপনি ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সুপ-প্লেট সাইজের একটি সোনার মেডেল পেয়ে যেতে পারেন। তবে কিনা, সেটা পাকা স্যাকরাকে দিয়ে যাচাই করে নিতে ভুলবেন না।

ইহুদী কিসিংগার এখন পায়লোয়ান যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার। তিনি কর্মভার গ্রহণ করে সর্বপ্রথম যে কার্যে হস্তক্ষেপ করেছেন, সেটি ইহুদী ও আরবদের মধ্যে দোস্তী স্থাপনা করার। ওয়াহ! ওয়াহ!! তবে কি না, আরবরা হয়তো তাদের পক্ষ থেকে আইখমানের যমজ ভাই থাকলে তাকে পাঠাতে পারে! অবশ্য তিনিও কিসিংগারের মত নিরপেক্ষ "মধ্যস্থতা" করবেন মাত্র! তাজ্জব, ইহুদী মিনিস্টারের তর সইল না, গদ্দিতে বসতে না বসতেই দেলেন ছুট ইজরেয়েলে জাত-ভাইয়ের ক'টা এটম বম দরকার তার তত্ত্বতাবাশ করতে। ইয়া, মালিক!

রুশদেশ কবে কোন্ আদিমযুগে ১৯১৭-এ কমুনিস্ট হয়ে যায়। সেই

থেকে আজ পর্যন্ত সাতিশয় কালে-ভাদ্র কানে এসেছে, কিছুসংখ্যক রুশদেশীয় ইহুদী প্যালেস্টাইন, পরবর্তীকালে ইজরায়েলে, চিরতরে যেতে চায়, আর জেদী বলশীরা তাদের যেতে দিচ্ছে না। তার পর বছর পাঁচসাত আর কেউ রা কাড়তো না।

ওমা! হঠাৎ দেখি, মার্কিন কংগ্রেস, না সিনেট, না কি যেন, গোঁ ধরেছেন, রুশ যদি ইহুদীদের ছেড়ে না দেয় তবে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবসা করার ব্যাপারে পয়লা সুযোগ পাবে না। এই ব্ল্যাকমেলের হুমকির পিছনে কে? মার্কিন ইহুদীরা যে অষ্টপ্রহর তওরাৎ তিলাওৎ করে এ দুনিয়ার মুসাফিরী খতম করে, এ-সব নশ্বর ফানী বখেড়া নিয়ে দাড়ি ঘামায় না, এই নবীন তত্ত্বটি আয়ত্ত করে বড়ই উল্লাস বোধ করলুম। কিন্তু হায়, সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা খবর মনে পড়ে যাওয়াতে আমার উল্লাসটা বরবাদ হয়ে গেল। যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টার যে এখন এক ইহুদী মহারাজ। যার কাছে একদা বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধ ছিল নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার, আজ রুশদেশের কোথায় কোন গোপন কোণে ক'গণ্ডা ইহুদী বাস করে, তাদের "খাহিস" হয়ে গেল "অকৃত্রিম আন্তর্জাতিক গুরুতর সমস্যা।"

বিশালতর ইজরায়েল?

এদের বের করে আনতে পারলে আরব-ইজরায়েল ব্যাপারে নিরঙ্কুশ "নিরপেক্ষ" ইহুদীকুলগৌরব কিসিংগার এদের জমিজমা ঘরবাড়ি দেবেন কোথায়? নিশ্চয়ই মারাত্মক রকমের "অভার-পপুলেটেড্" আমেরিকায় নয়। সে কি করে হয়, পাগল নাকি?

ভাবছি, ক হাজার আরব মুসলমানকে খেদিয়ে এদের জন্যে স্থান করবেন নিরপেক্ষ কিসিংগার কোথায়?—ফলস্তীনে, সীরিয়া লেবানন জয় করে?

গোড়াতেই তাই নিবেদন করেছিলুম, নিকট প্রাচ্যের গোটা চারেক ঘুড়ি, বিশ্বের গোটা চারেক শক্তির ঘুড়ি, কোথায় রুশের ইহুদী ঘুড়ি আর কোথায় মার্কিন ইহুদী ঘুড়ি, তার কাপ্তেন কিসিংগারের রাম-মাঞ্জাওলা অতগুলো ঘুড়ি ঝেঁটিয়ে, একজোট করে, বাদাম প্যাঁচে সব-কটাকে কাটবো, হেন এলেম আল্লা দেননি।

"দূরকে করিলে নিকট বৈরী"

আমাদের বিখ্যাত সাধক কবি লালন ফকির গেয়েছেন,

হাতের কাছে পাইনে খবর
খুঁজতে গেলাম দিল্লী শহর

জার্মান কবি গ্যোটেও বলেছেন

দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
সুখ সে তো সদা হেথায় আছে
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
সুখ সে রয়েছে হাতের কাছে।

সুখের বেলা হবেও বা। কিন্তু দুঃখটা খুব সম্ভব আসে দূরের থেকে। কারণ দুঃখটার উৎপত্তি যদি 'হাতের কাছেই' হত তবে তাকে ধরবার কায়দাটা রপ্ত করে নিয়ে টুঁটিটা চেপে ধরে তাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতুম না?

"নিকট প্রাচ্যের" সর্বনাশ তো তৈরী হয় দূর বিদেশে, আমাদের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। বাংলাদেশ ভারত আফগানিস্তানের দম বন্ধ করার জন্য দড়ি পাকানো হয় দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে, থুড়ি, দজ্জালিনীপুরে। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত অতি গভীর বিশ্বাস সে দুঃখ নিবারণার্থে ভিন দেশের দিকে তাকিয়ে থাকাটার মত আকাট আহাম্মুখি আর কিছুই হতে পারে না। আপনার আমার আপন দেশের লোক আপন ধর্মের ভাই যে ভাবে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আপনাকে আমাকে দুঃখ-বেদনা দিল, তার পরও ভরসা রাখব বিদেশীর উপর? কার্ল মার্কসের উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বিশ্ব প্রলেতারিয়ার প্রতি ঐক্যবদ্ধ হতে যে আদেশ দিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের সর্ব জনের উপর খাটে। এ দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে শোচনীয় জীবন ধারণ করে তার চেয়ে বিলেতের তথাকথিত প্রলেতারিয়ার জীবন শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর এদেশে সত্যকার ধনী যাঁরা, ফুলে উঠেছেন যাঁরা, তাঁদের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানাবার রত্তিভর প্রয়োজন নেই। তাঁরা বাস্তুঘুঘুর পাল। সময় থাকতেই এক লম্ফে আমাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে গোলে হরিবোল দেবেন। আমার শুধু আশঙ্কা আখেরে নেতৃত্বটা না তাঁদের হাতেই চলে যায়। যা হয়েছে শত বার হয়েছে, এদেশে, ভিন দেশে, সর্ব দেশ—অতীতে। তাই থাক এ প্রসঙ্গ উপস্থিত ধামা-চাপা।

বলছিলুম, আসমানে বিস্তর চিড়িয়া "বাদাম প্যাচের" করকরে মাঞ্জা লাটাইয়ে তো নেইই, তার উপর একটা বিরাট বাজ পাখী আসমানী রঙের সঙ্গে তার আগাপাস্তলা এমনই মিলিয়ে দিয়ে আচানক ছোঁ মারে যে তার কোনো কিছুই ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে আসে না। নেই নেই করে তবু দু' পাঁচজন মার্কিন আছেন যারা বাজটাকে চেনেন—কিন্তু ওর সম্বন্ধে মুখটি খুলেছেন কি তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের ইন্না লিল্লাহী—

বিশ্ব ইহুদী, ইহুদীতন্ত্র জায়োনিজমের কেন্দ্রভূমি এখন আমেরিকায়। একদা ছিল অস্ট্রিয়া ও জর্মানিতে। মেটারনিষের যে ভিয়েনা-কংগ্রেসের কথা কিসিংগার সুবাদে উল্লেখ করেছিলুম সে কংগ্রেসে সর্ব নেশনের উদ্দেশ্যে যে সব অনুরোধ আদেশ জানানো হয়, তারই একটা—ইহুদিদের ব্যাপকতর রাষ্ট্রাধিকার দেবার জন্য, বিশেষ করে জর্মানিতে। সাধে কি আর জর্মন ইহুদি কিসিংগার মেটারনিষকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিলেন! সম্পূর্ণ অবাস্তর নয় বলে মনে প্রশ্ন জাগে শিষ্য কিসিংগার কি একদিন গুরুর মত ইতিহাসে তাঁর নাম রেখে যেতে পারবেন? সে আলোচনা ক্রমশঃ আলোচ্য ও প্রকাশ্য; উপস্থিত একটি তথ্য পাঠকের স্মরণে এনে দি—জর্মনির মহাকবি হাইনরিখ হাইনের বয়স আঠারো—ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়। সে কংগ্রেসের সুপারিশ অনুযায়ী অধিকার লাভের ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বার্লিনে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ইহুদীরা আপন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন ও যুবা হাইনে সেটিতে সোৎসাহে যোগদান করেন। সদস্যরা আনন্দে আটখানা হয়ে হাইনেকে কোলে তুলে নেন, কারণ তখন হাইনের খ্যাতি জর্মানির ভিতরে বাইরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শতাধিক বৎসর ধরে যে হাইনের খ্যাতি অদ্যাবধি ক্রমবর্ধমান, নবজাতকসম অম্লান পদদলিত প্রণয় নিবেদনের মর্মদাহ সরলতম ভাষায় প্রকাশ করতে আজো যার সমকক্ষ কেউ নেই, অনুভূতির ভুবনে তাঁকে প্রবঞ্চিত করতে পারবে কোন কৃত্রিম আত্মম্ভরিত্বের প্রতিষ্ঠান! ইহুদিদের এ সব প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি ছিল, তারা জেহোভার নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, তাদের প্রাচীন কীর্তির কাছে কি মিসর কি ব্যাবিলন বিশেষ করে গইম (অ-ইহুদী তুচ্ছার্থে, যে রকম আমাদের ভাষায় অনার্য কাফের প্রভৃতি শব্দ আছে) গ্রীক-রোমান ভারতীয় আর্য সভ্যতা দুগ্ধপোষ্য শিশুবৎ—এবং সবচেয়ে মোক্ষমতম তত্ত্ব তাঁদের 'মসীয়া' (আরবীতে মসিহ মাহদী অর্থে) একদিন ধরাতলে অবতীর্ণ হয়ে

গিয়ে ইহুদীকুলকে শেষ ধাক্কা দিয়ে বিনাশ করবেন, না হাইনের সৎদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শূন্যে আলোক-লতার মত দোদুল্যমান হৃদয়ভাপে ভরা ইজরায়েলী রাষ্ট্রের ফানুসটাকে ফাটিয়ে দিয়ে তাঁর স্বজাতি ইহুদী কওমকে বাঁচাতে সক্ষম হবেন? তা যদি পারেন—বিরাট বসুন্ধরায়, আল্লার কুশাদা দুনিয়ায় নিরীহজনকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ না করেও বিশ্ব ইহুদীর উমদা-গুপ্তাইস হয়—তবে তিনি হাইনের খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারবেন। হজরৎ মুসা যে রকম একটা ইহুদী কওমের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

* * * *

একটা মজাদার দিলচসপ সার্কাসের ক্লাউন ঢঙের খবর পাঠককে না জানিয়ে লেখাটা শেষ করতে পারছিনে। যাঁরা জানেন তাঁরা অপরাধ নেবেন না। তেসরা রমজানের সেহরীর সময় বেতার নাড়াতেই হঠাৎ শুনি সিলেটী বাংলা! উচ্চারণ মোটামুটি ভালোই, খবর দিচ্ছে মিঃ ভুট্টোর দিগ্বিজয় বাবদ। তার পর সালঙ্কার সবিস্তর বয়ান দিলে, যে সব বাঙ্গালী পাকিস্তান থেকে শিগ্‌গীরই বাংলাদেশ ফিরে যাবেন তাঁদের কেনাকাটা সম্বন্ধে তাঁরা খবর পেয়েছেন বাংলাদেশে সব মাল বড্ড আক্রা, ইণ্ডিয়ার আমদানী মাল বড্ড নিরেস।

ঠিক এই ধরনের ব্রডকাস্ট করা হয়েছিল '৭১-এর নবেম্বর-ডিসেম্বরে, বিলাতবাসী সিলেটীদের জন্য। উদ্দেশ্যটা চটসে বোঝা যেত যদিও সেটা কামুফ্লাজের চেষ্টা জোরসে করা হয়েছিল, "ভাই বিলেতবাসী সিলেটটীগণ, পূর্ব পাকের সর্বত্র পরিপূর্ণ সালামত। তোমরা আত্মীয়স্বজনকে যে টাকা পাঠাও সেটা বন্ধ করো না। সরকারের জরীয়ায় পাঠিয়ো কিন্তু।" এই শেষটাই ছিল আসল মৎলব। আমি অবশ্য স্থানাভাববশত অতি সংক্ষেপে সারছি।

এবারে মৎলব দুটো: যুদ্ধবন্দীদের বিচার করে কি হবে? এই তো বাঙ্গালীরা ফিরে যাচ্ছে দেশে। বউ-বাচ্চার সঙ্গে মিলিত হবে। ঐ বন্দীদেরই বা আটকে রেখেছো কেন, তাদের কি বউ-বাচ্চা নেই? দ্বিতীয় ভুট্টো সাব চান, বাংলাদেশের সঙ্গে দোস্তী করতে। পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। দুই দেশে দোস্তী হলে উপকার উভয়ত: গয়রহ গয়রহ।

তোলা হল না একটি কথা: কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পীকটি নট, নট কিচ্ছু। ভারী মজার প্রপাগাণ্ডা। রসে টইটুম্বর। বারান্তরে হবে।

লণ্ডনী স্বীকৃত বাংলাদেশ ?

রাত পৌনে তিনটে থেকে সোয়া তিনটে অবধি সিলেটী ভাষায় পাক বেতার বিলেতবাসী সিলেটীদের জন্য প্রোগ্রাম দেয়। দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। নিজেদের নামও বলেছে তারা, আমার মনে নেই। আমি বাড়িয়ে বলছিনে, কিন্তু মনে হল, তাদের কণ্ঠস্বর বড়ই প্রাণহীন। ১৯৭১-এর নবেম্বর ডিসেম্বরে যারা এই প্রোগ্রামটি আঞ্জাম করতো তাদের বেশ দু'তিনজন গাঁক গাঁক করে হুঙ্কার ছাড়তো, তাদের কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাসের স্পষ্ট আভাস থাকতো। বেচারীরা জানতো না, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক মনে নেই, ষোল-সতেরো ডিসেম্বরে সে প্রোগ্রাম উঠে গেল। ওদের সম্বন্ধে একটা কথা কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায়। ওরা প্রতিদিন নিজেদের সিলেটী সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিল এবং খাঁটি সিলেটীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যেমন, প্রথম দিন প্রোগ্রাম পরিচিতির সময় শেষ দফায় বললে, সর্বশেষে সিলেট থেকে যাঁরা আপন আপন "আত্মীয়-স্বজনকে" খবর পাঠাবেন, সেগুলো আপনারা শুনতে পাবেন। কিন্তু "আত্মীয়-স্বজন" সমাসটি আমরা বড়ই শাজ-বাজ ব্যবহার করি। পরের দিন ঘোষক "আত্মীয়-স্বজনের" পরিবর্তে বললে "ভাই-বরাদর"। আমি মনে মনে বললুম "লেড়কার তরক্কী অইছে। মাশা আল্লা।" পরের দিন ছোকরা একেবারে বন্দর-বাজারের চৌকে পৌঁছে গেল। বললে "খেশ-কুটুমর লগে মাতিবা।" আমি ফাল দিয়ে উঠে বললুম, "সাবাশ! ঔতত বেটায় চাক্কু মারি দিছে।" পাঠক হয়তো তপ্ত-গরম হয়ে খাট্টা গেরাবী দেবেন, "তুমি তো বড় বইতল, মশায়! বাংলাদেশের খেলাফে আজেবাজে বকছে, আর তুমি বলছো, সাবাশ!" আহা—আমি ভাষাটার কথা বলছি, তার বক্তব্যের—কিতাবের টেকনিক্যাল পরিভাষায় যাকে বলি "মৎন", সেটার—তারিফ করতে যাবো কেন? সেটা তো গাছে আর মাছে ভুয়া বন্দর-বাজারী গফ। তা সে যাকগে, এর পরের প্রস্তাব পাড়ার পূর্বে, ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত "গেরাবী" শব্দটি খাস সিলেট-নাগরিক ভিন্ন অন্য সিলেটী এবং আর পাঁচজন আঞ্চলিক ভাষানুসন্ধানীজনকে বুঝিয়ে দি। টিপ্পনী কাটা, গহার বা বাগার দেওয়া, ঘটিদের ফোড়ন দেওয়া আর গেরাবী দেওয়া একই ইডিয়ম! সিলেট শহরের আশে-পাশে যখন ইংরেজ ম্যানেজারদের চা-বাগিচা বসলো তখন বাবুর্চী খানসামারা মেম সায়েবদের কাছে মাছ-গোস্তর "মাখো মাখো ঝোল"-এর পরিভাষা "গ্রেভি" শব্দটা শিখল। তার থেকে "গেরাবী"। আমার জানা মতে এ রকম আরো গোটা ছয় ইংরিজি

শব্দ সোজাসুজি সিলেটীতে ঢুকেছে। এই ধরনের একটি ভারি মজাদার শব্দের সঙ্গে সেদিন পরিচয় হল, চাটগাঁয়ের আঞ্চলিক ভাষাতে। "অস্তিম্যান" শব্দটি প্রথম দর্শনে মনে ভীতির সঞ্চার করে। জীবনের 'অস্তি' অবস্থা—'অস্তিম' 'মান' বুঝি এসে গেল! প্রখ্যাত সাহিত্যিক, আমাদের পথ-প্রদর্শক মহবুবুল আলমের ভ্রাতা ওহীদুল আলম সাহেবের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'পৃথিবীর পথিক'-এর পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মমাগ্রজ মুর্তাজা সাহেব আমাকে অভয় দিয়ে ছাপার হরফে লিখেছেন, "অস্তিম্যান হাওনোটের অন ডিমাণ্ড" উক্তি থেকে এসেছে।

পাছে বিলাতবাসী সিলেটীদের (এদের সিলেটবাসীরা "লণ্ডনী" নাম দিয়েছেন) পূর্বোক্ত শব্দ-সঙ্কটে ত্রাসের সঞ্চার হয়, তাই করাচীর সিলেটী অনুষ্ঠানে ঘোষক, অনুবাদক বিকট বিকট ইংরিজি শব্দ আদৌ অনুবাদ করেননি। যেমন প্রটোকল, এটমিক এনার্জি কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু কারখানা অর্থে প্লাণ্ট (মার্কিনী উচ্চারণে প্ল্যাণ্ট) কেন যে অনুবাদ করলেন না, বোঝা গেল না। ওদিকে জনগণ (আমরা বলি পাঁচজন, পাব্জন), বন্যা (বান, ছয়লাব), "ফসল ক্ষতিগ্রস্ত অইছে" (আমরা বলি ফসলার লুকসান অইছে) এবং সবচেয়ে মজার —সিলেটী "মধ্যাহ্ন ভোজনের" জন্য সংবাদ-পাঠক বললেন "মাদাউনকুর ভোজ।" মাদাউনকুর খানা, দাওৎ বা জিয়াফত আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আর এ স্থলে এটা আজীজ আহমদের দেওয়া দাওৎই ছিল—তাই "মাদাউনকুর ভোজ"-এর মত বিজাংগা গুরুচণ্ডালী একমাত্র করাচীতেই সুলভ।…পত্র-লেখকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষক ঠিকানা দিলেন "পশ্চিম" পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান তো কবে মরে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে সহবাস করার একটা গল্প মোপাসাঁ লিখেছেন বটে! প্রেতাত্মা নিয়ে লিখে আমি নোবেল প্রাইজ পাবো, নির্ঘাৎ।

রেকর্ড সঙ্গীতে "কাফিরী" কীর্তন-সুরে উর্দু গীত বাজানো হল। সে এক অদ্ভুত ভূতুড়ে রসের অবতারণায় কুল্লে ঘরটা যেন ছিম ছিম, মাথাটা তাজ্জিম-মাজ্জিম করতে লাগলো।

আল্লা জানেন, আমি সিলেটী প্রোগ্রামের এই তিনটি প্রাণীকে নিয়ে মস্করা করছিনে। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, এরা যেন অতিশয় অনিচ্ছায় একটা অপ্রিয় কর্ম করে যাচ্ছেন এবং বার বার আমার মনটা বিকল হয়ে যাচ্ছিল। বেচারীরা! এত শত লোক দেশে ফিরে আসছে, এরা চলে আসে না কেন? হয়তো বাধা আছে।

ঢাকায় জনাব ভুট্টোর আসন্ন শুভাগমন

কিন্তু পাঠক, মাত্রাধিক বিষণ্ণ হবেন না। আপনাদের জন্য একটি খুশ-খবর কোনো গতিকে জিইয়ে রেখেছি। যাঁরা রীতিমত পাক বেতার শুনে থাকেন, তাঁরাও একই খবর শোনার আনন্দ দুবার করে পাবেন, বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একখানা বাকিরখানী খেলে যে রকম দু'খানি খাওয়া হয়। পাকিস্তান থেকে যখন একদল বাঙ্গালী দেশে ফেরার জন্য প্লেনে উঠছেন তখন মিঃ ভুট্টো তাঁদের উদ্দেশ্যে উর্দুতে একটি ভাষণ দেন। নানাবিধ মূল্যবান তত্ত্বদানের পর মিঃ ভুট্টো বলেন, আপনাদের সঙ্গে ফের দেখা হবে। করাচীতে, লাহোরে কিংবা ঢাকা বা চাটগাঁয়।

যাদের মস্তিস্ক উর্বর তারা তো সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ চিন্তাসূত্রের সম্মুখে দিশেহারা হয়ে যাবেন, কোনোটারই খেই ধরতে পারবেন না। আমার সে ভয় নেই। আমি ভাবছি মিঃ ভুট্টো কি বাংলাদেশ জয় করে ঢাকা চাটগাঁয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন, না দুই দেশে রাতারাতি এমনই দহরম-মহরম হয়ে যাবে যে আমরা হরদম পিকনিক উইক-এণ্ড করার জন্য খনে লাহোর খনে পিণ্ডি যাবো, কনসেশন রেটে গিয়ে হব স্টেট গেস্ট! অবশ্য এটা লক্ষণীয় মিঃ ভুট্টো কুয়েটা বা পেশাওয়ারে মোলাকাৎ হবে এ কথাটা বলেননি। বাংলাদেশ হাতছাড়া হওয়ার পর বেলুচ এবং পাঠান মুল্লুক এখন লাহোরের পাঞ্জাবীদের এবং করাচীর খোজা-বোরা-সিন্ধিদের কলোনি হয়ে গিয়েছে—দুষ্ট লোকে এমন কথাও কয়। বাঙ্গালীকে ওসব দেখানো দুলহাভাইকে তালই সাহেবের বাড়ী দেখানোরই শামিল।

ছি ছি এত্তা জঞ্জাল

(১) সকলেই জানেন ওয়াটারগেটের জল যখন ডেনজার লেভেলে চড়েছিল তখন নিক্সন বলতে গেলে এক রকম পর্দানশীন হারেমবাসী হয়ে গিয়েছিলেন তারপর তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এসে এমনই কর্মকীর্তি আরম্ভ করলেন যে আমেরিকার যেসব তালেবর পত্রিকা গণ্ডায় গণ্ডায় নামে রিপোর্টার কাম ডিটেকটিভ মোটা মোটা তখমা দিয়ে পোষে তারা পর্যন্ত হদীস পায়নি, এখনো পাচ্ছে না। (২) এমন সময় আরো একটা মারাত্মক কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা

বেরিয়ে পড়লো। স্বয়ং নিক্সন কর্তৃক মনোনীত তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট (সংক্ষেপে ভীপ) এ্যাগনো সরকারী উকিলের নোটিশ পেলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ মেহেরবাণী করে দেওয়া কণ্ট্রাকটের কমিশন গ্রহণ, খাদ্য-মদ্যাদির নিয়মিত ভেট গ্রহণ—এক কথায় দুর্নীতির জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা হবে। নিক্সন ভীপকে এক ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি করলেন, তিনি যেন রিজাইন দেন। নিন্দুকে বলে, ভীপকে কাবু করার জন্য নিক্সনের খাস-দফতরের নাকি কারসাজি আছে এবং আসলে তিনি নাকি এ্যাগনোকে খেদিয়ে একজন দড় মানুষকে ভীপ বানিয়ে আনতে চান, যে তাঁর হয়ে—ওয়াটারগেট মামলা যদি নিতান্তই খারাপের দিকে বেয়াড়া গুড্ডির মত মুণ্ড খেতে থাকে তবে—জব্বর লড়াই দেবে। সেই লোভে ইতিমধ্যেই নিক্সনের প্রতিপক্ষ ডেমোক্রাটিক পার্টির এক জাঁদরেল চাঁই শিঙ ভেঙে রিপাবলিকান দলে ভিড়ে যত্রতত্র চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করেছেন, টেপ দেওয়া না দেওয়ার পুরো এখতেয়ার একমাত্র প্রেসিডেণ্টের। (৩) এতদিন কিসিংগার থাকতেন নেপথ্যে। কিন্তু একদিন কংগ্রেসের সামনে নিক্সনের ফরেন মিনিস্টারকে দিতে হবে সাফাই। অতএব তাঁকে দাঁড় করানো হল কাঠগড়ায়। ওদিকে তিনি যে তাঁর বন্ধু।

অভিশপ্ত ফলস্তীন

চল্লিশ বৎসর পূর্বে মিশরের আলআজহারে ছাত্রাবস্থায় থাকাকালীন ফলস্তীন দেখতে যাই। তাই বলে নয়, এমনিতেই ভবঘুরে বলে আমার একটা বদনাম আছে। শতাধিকবার আমি এই অবিচারের বিরুদ্ধে যতবার দেমাতি প্রকাশ করেছি পাঠক-সাধারণ ততই মুচকি হেসে, দ্বিগুণ উৎসাহে, আমাকে ভবঘুরেমী থেকে বাউণ্ডুলে পদে প্রমোশন দিয়েছেন। তবু শেষ বারের মত, আবার বলে নিই, যে-কোনো প্রকারের স্থান পরিবর্তন শারীরিক নড়ন চড়ন আমার দু'চোখের দুশমন। কট্টর মরণ-বাঁচন সমস্যা দেখা না দিলে আমি বারান্দা থেকে ব্লক-এ পর্যন্ত রোলস-এ চড়েও যেতে রাজী হই না। বিছানা থেকে গোসলখানায় যাবার তরে জনকল্যাণ সরকারকে একটা বাস সার্ভিস খুলতে সকরুণ দরখাস্ত পাঠিয়েছি।

অপিচ, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবো, 'ফলস্তীন' গিয়েছিলেম সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সোৎসাহে। অবশ্যই, লাঞ্ছিত পদদলিত আরবদের দুরবস্থা দেখবার জন্য নয়। তখনো সে দুর্দিনের ঝড়-তুফান আরম্ভ হয়নি। কিন্তু তার ইতিহাস আমি

পাঠকের উপর এখন চাপাতে চাইনে। ওপার বাংলায় একবার চেষ্টা দিয়েছিলুম—আমি আর প্রুফ রীডার ছাড়া সে সীরিজ কেউ পড়েনি।

ফলস্তীনের দুর্দশার জন্য দায়ী কে?

ইহুদীদের চেয়ে আরবদের—মুসলমানদের—আমি দোষ দি বেশী।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইংরেজও ইহুদীদের পালে পালে ফলস্তীনে আসতে দেয়নি। বস্তুত হজরত ওমরের আমল থেকে শেষ তুর্কী খলিফার রাজত্ব অবধি সব সময়ই কিছু কিছু ইহুদী, এমন কি জার-আমলে রুশ ইহুদীও পুণ্যভূমিতে এসে বাসা বেঁধেছে। তারা ছিল গরীব বা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। আরবদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তাদেরই মত দু'পয়সা কামিয়ে দুঃখে-সুখে দিন কাটিয়েছে। কালক্রমে তাদের মাতৃভাষাও হয়ে গেল আরবী। সঙ্কীর্ণ হলেও আরবী সাহিত্যে তাদের স্থান আছে।

চাষার সর্বনাশ

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যারা এল তারা সঙ্গে নিয়ে এল অফুরন্ত অর্থ-ভাণ্ডার। যুদ্ধের সময়ই সারা বিশ্বজুড়ে ইহুদী সম্প্রদায় জেনে গিয়েছিল মিত্রশক্তি পুণ্যভূমি ফলস্তীন তাঁদের হাতে সঁপে দেবেন, তারা সেখানে, পাক্কা দু হাজার বছর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার জেহোভার "জায়নের" নবীন রাষ্ট্র নির্মাণ করবে।. প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তি কিন্তু আদপেই "ইহুদী রাষ্ট্র" নির্মাণের কোনো ওয়াদা কাউকে দেয়নি। তারা বলেছিল ইহুদীরা গড়ে তুলবে "জুয়িশ ন্যাশনাল হোম"—এবং এই "হোম" কথাটার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল বারংবার। কিন্তু ইহুদীরা সেটা জেনে শুনেও প্রচার চালালো সেটাকে রাষ্ট্র নাম দিয়ে। সেই রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য যে, কী পরিমাণ অর্থ, পরবর্তীকালে অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো হয়েছিল সেটার চিন্তামাত্র করা ডাঙ্গর ডাঙ্গর ব্যাঙ্কার মহাজনদেরও কল্পনার বাইরে।

ফলস্তীন কাঠ-খোট্টা দেশ বটে কিন্তু সে দেশের নায়েবরা গরীব চাষা-ভূষোদের লহু ফোঁটায় ফোঁটায় শুষে নেবার তরে যে কায়দাকেতা জানে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে শাইলকের চেয়েও ধড়িবাজ ইহুদী সম্প্রদায়। ওদিকে নায়েবদের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে জমিদাররা ফূর্তি করতেন মধ্যপ্রাচ্যের মস্তে-কার্লো, বিলাসব্যাসনের হুরীস্তান বেইরুতে। মদ্য মৈথুনের ব্যবস্থা সেখানে অত্যুত্তম এবং জুয়োর কাসিনোতে এক রাতে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও বেশী

সর্বস্ব হারানো যায়। কাইরো ইস্কন্দরীয়াও এ সব বাবদে সে আমলে খুব একটা কম যেতেন না। এসব বিলাসের কেন্দ্রে লেগে গেল জমিদারী বেচার হরির-লুট। ইহুদীরা ধীরে ধীরে কিনে নিল কখনো সোজাসুজি কখনো বেনামীতে ফলস্তীনের বিস্তর জমিজমা।

সে দেশের একাধিক যুবক আমাকে পই পই করে বোঝালেন,—না, প্রজা-স্বত্ব আইনফাইন ওসব দেশে কস্মিনকালেও ছিল না। থাক আর নাই থাক, প্রচুর জমি-জমা চলে গেল ইহুদীদের হাতে। বিস্তর আরবদের করা হল উচ্ছেদ। সেই পরিমাণে বয়তুল মকুদ্দসে (সংক্ষেপে কুদস, চালু উচ্চারণে উদস), অর্থাৎ জেরুজালেমে বাড়তে লাগলো ভিখিরীর সংখ্যা।

আরবদের অনৈক্য ইহুদীর প্রধান অস্ত্র

কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে একদিন অবস্থা এমন চরমে গিয়ে দাঁড়ালো যে ফলস্তীনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগে ইহুদী ইজরায়ল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল, সেটা সবিস্তর বলার কণামাত্র প্রয়োজন এস্থলে নেই। ইহুদীর হাতে আছে কড়ি, তদুপরি আছে দুর্নীতিতে পাজীর পা-ঝাড়া ফলস্তীনের ভিতরে-বাইরে আরব "নেতারা"।

এক নীগ্রো বলেছিল, "গোরারায়রা যখন আমাদের দেশে এল, তখন তাদের হাতে ছিল বাইবেল, আমাদের ছিল জমি। আজ জমি ওদের, বাইবেল আমাদের হাতে।"

ফলস্তীনের মুসলিম চাষা ইহুদীদের কাছ থেকে তৌরীত তালমুদ চায়নি, পায়ওনি। চাইলেও পেত না। কারণ বহু যুগ হল, ইহুদীরা দীক্ষা দিয়ে বিধর্মীকে আর আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। আরবদের দীক্ষা দিলে আরেক বিপদ। স্বধর্মে নবদীক্ষিতজনকে তো চট করে তার বাস্তুভিটে থেকে তাড়ানো যায় না। আফ্রিকায় গোরারায়রা ধর্মের বদলে লব্ধ জমির খাজনা নিয়েই ছিল সন্তুষ্ট; নীগ্রোদের উচ্ছেদ করে সেখানে বিলিতী চাষা বসাতে চায়নি। ইহুদীরা কিন্তু চায় জমিটার দখল। ১৯১১-এ পাঞ্জাবীরাও এ দেশে বলতো, "জমীন চাহিয়ে। আদমী মর যায় তো ক্যা!"

তখনো ঠেকানো যেত ইহুদীদের। আরব রাষ্ট্রগুলো যদি গৃহ-কলহ ভুলে গিয়ে এক জোট হত। তারস্বরে প্রতিবাদ করেছে তারা, কিন্তু তার অধিকাংশই ছিল ফাঁপা, মিথ্যা, ভণ্ডামি।

আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, "ওহে ভবঘুরে, এ দুনিয়ায় সব চেয়ে তাজ্জব তিলিসমাৎ কি দেখেছ?" আমি এক লহমার তরেও চিন্তা না করে বলবো, "এই আরব জাতটা! ইরাক থেকে আরম্ভ করে ঐ বহুদূর সুদূর মরক্কো অবধি বাস করে আরব জাত—অবশ্য সর্বত্রই কিছু না কিছু সংমিশ্রণ হয়েছে (পৃথিবীতে অমিশ্র জাত আছে কোথায়?)। এই আরবদের দেহে আরব রক্ত, এদের ভাষা আরবী, এদের ধর্ম ইসলাম। মিলনের জন্য যে তিনটে সর্বপ্রধান গুরুত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন, সে তিনটেই তাদের আছে। অথচ খুদায় মালুম, তারা আজ ক'টা রাষ্ট্রে বিভক্ত। এবং সেই খানেই কি শেষ? মাশাল্লা, সুবানাল্লা—বালাই দূরে যাক! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তারা এখনো যা প্রাণঘাতী কলহে লিপ্ত হয়, ভবঘুরে আমি—কোথাও দেখিনি,—পুস্তক-কীট আমি, কোথাও পড়িনি।

আর বাইরের শত্রু-মিত্রের কথা যদি তোলেন, তবে সক্কলের পয়লা স্মরণে আসেন ইহুদী শ্রেষ্ঠ হের হাইনরিষ আলফ্রেড কিসিংগার। একদা নবী মূসা নিপীড়িত ইহুদীদের রক্ষা করেছিলেন জালিম মিসরীদের হাত থেকে। ইনিও এ যুগে সেই খ্যাতি অর্জন করবেন—তবে কিনা, এবার বাঁচানো হবে জালিমকে মিসরীদের হাত থেকে।

গয়নীতি

ইংরেজ এই উপমহাদেশের ক্ষয়ক্ষতি করেছে বিস্তর, একথা বলা যেমন সত্য ঠিক তেমনি একথাটাও সত্য যে তারা আমাদের অল্পবিস্তর উপকারও করেছে। কিন্তু অপকারের দফে দফে বয়ান দেবার সময় একথা কখনো বলা চলবে না, তারা আমাদের চাষাভুষোদের উচ্ছেদ করে সেখানে আপন জাত-ভাই গোরা-রায়দের বসাবার চেষ্টা করছে, কিংবা এ রকম কোনো একটা কুমতলব তাদের ছিল। এ দেশে হিন্দু-মুসলমান জমিদারে ঝগড়া-কাজিয়া হয়েছে প্রচুর, কিন্তু মুসলমান চাষাদের পাইকিরি হিসেবে ঝেঁটিয়ে হিন্দু জমিদার তার জাত-ভাই হিন্দু চাষাকে পালে পালে পত্তনি দিয়েছে, এমনতরো বার্তা কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না এবং তার উল্টোটাও না। যদিস্যাৎ কালেকস্মিনে হয়ে থাকে তবে সেটা নিতান্তই ব্যত্যয়।

কিন্তু ইহুদীকুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেদিন থেকে ফলস্তীনে আসা আরম্ভ করল সেদিন থেকেই তাদের পুরো পাক্কা প্ল্যান ছিল, এ দেশে তাদের কর্ম-

পদ্ধতিটা হবে কি প্রকারের। একদিনে না, এক বৎসরে না,—ধীরে ধীরে কিন্তু মোক্ষম ঘা মেরে মেরে, ছুঁচ হয়ে ঢুকবে এবং ফাল হয়ে বেরুবে। না, ফাল হয়ে সেখানে আস্তানা গাড়বে। সেই মর্মে স্থির করা ছিল :

(১) "হোম"-ফোম ওসব বাজে কথা নয়। সম্মুখে রাখতে হবে ধ্রুব উদ্দেশ্য—এ দেশে গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বাধিকারসম্পন্ন, সর্বার্থে স্বাধীন পরিপূর্ণ রাষ্ট্র। এবং সে রাষ্ট্র হবে "বিশুদ্ধ" ইহুদী রাষ্ট্র। সম্পূর্ণ "গয়"-বর্জিত। পাঠকের উপকারার্থে নিবেদন, ইহুদীদের প্রচলিত ভাষায় ইহুদী ভিন্ন এ দুনিয়ার কুল্লে নরনারীকে 'গয়' শব্দের মারফৎ পরিচয় দেওয়া হয়। কট্টর ধর্মান্ধ ইহুদীর কাছে সব গয় বরাবর। সাধু-পাষণ্ডে, নিষ্ঠুর-সদয়ে, চোর-পুলিশে, ডাক্তার-ফাঁসুড়েতে কোন তফাত নেই। আমরাও শাজ-বাজ কাফির শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু অমুসলমান মাত্রই কাফির, ওদের ভিতর ভালো-মন্দে কোনো তফাৎ নেই, এ রকম একটা আজগুবী তত্ত্ব কেউ এ যাবত প্রচার করেননি। তদুপরি গয় শব্দের সঙ্গে যে পাশবিক ঘৃণা মেশানো থাকে, কাফির শব্দের চতুর্দশ পুরুষ তার গা ঘেঁষতে পারবে না।

(২) রাষ্ট্রকে গয়-মুক্ত করার জন্য সর্ব আচরণ বৈধ। জনৈক ইহুদী সজ্জনই একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখে ইহুদী তথা বিশ্বজনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, হিটলার যে জর্মানিকে ইহুদী মুক্ত করতে চেয়েছিলেন সে শিক্ষা তিনি পান ইহুদীদের কেতাব থেকে। গ্যাস-চেম্বার তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

একথা আমি অতি অবশ্যই বলবো না, সে আমলে বা এখনো সব ইহুদীই এসব বিধানে বিশ্বাস করেন। বস্তুত আমার বিস্তর ইহুদী বন্ধু ছিলেন, এখনো আছেন যাঁদের প্রতিবেশীরূপে পেলে যে কোনো মুসলিম নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করবে। কিন্তু মানুষের বদ-কিস্মৎ, রাষ্ট্র-নির্মাণ-কর্মে এঁদের ডাক তো পড়েই না, বরং এসব অন্যায় গোঁড়ামি, বিশ্বমানবের প্রতি অশ্রদ্ধাসূচক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললে তাঁরা হন লাঞ্ছিত বিড়ম্বিত। সভাস্থল থেকে এঁরা বহিষ্কৃত হন নানাবিধ অশ্রাব্য গালাগাল শুনতে শুনতে। এ পরিস্থিতি এমন কোনো সৃষ্টিছাড়া অভিনব ঘটনা নয়। প্রভু খৃষ্টের আমলেও ইহুদীরা চরমপন্থার অনুরক্ত ভক্ত ছিল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোস করতে কিছুতেই সম্মত হত না। তাই প্রভু খৃষ্ট তাঁর সর্বপ্রথম ধর্মোপদেশ দানকালে "মুখ খুলিয়াই" বলেন, "ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন (অর্থাৎ আপন রূহ-এর গরীবী সম্বন্ধে সবিনয় সচেতন) কারণ তাঁদেরই নসীবে আছে বেহেশত।"

এরপর তাঁর সপ্তম উপদেশেই প্রভু বলছেন "তাঁরাই ধন্য, যাঁরা (দুই বৈরী পক্ষের মাঝখানে) শান্তি-সুলেহ নির্মাণ করেন।" খৃষ্টের এ উপদেশ গোটা ইহুদী জাত তাদের "মৃত সমুদ্রে" ডুবিয়ে দিয়ে তাঁকে ক্রুশে চড়িয়ে মারে। রোমান গবর্নর তাঁকে বাঁচাবার জন্য কি প্রকারের চেষ্টা দিয়েছিলেন, একটার পর আরেকটা সুলেহ পেশ করছিলেন, মথি মার্ক ইত্যাদিতে আছে কিন্তু ইহুদী জনতা শুধু চিৎকারের পর চিৎকার করেই চলেছে--"ক্রুশে মারো। ক্রুশে চড়িয়ে মারো ওকে।" সুলেহ মাত্রই তাদের কাছে দুর্বলতার লক্ষণ। সমস্ত ঘটনাটি এমনই নাটকীয় যে এর পুনরাবৃত্তি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে না।

শেষটায় গবর্নর পিলাতে যখন দেখলেন তিনি তাঁর প্রচেষ্টাতে এক কদমও এগুতে পারছেন না (হি ওয়াজ নট গেটিং এনিহোয়ার) তিনি একটা ডাবর ভর্তি পানি আনিয়ে জনতার সামনে দু'হাত ধুয়ে বললেন, "এই নির্দোষ সাধু ব্যক্তির রক্তপাতে আমার কোনো কসুর রইল না।" উন্মত্ত জনতা চেঁচিয়ে উত্তর দিলে, "এর লহুর দায় আমাদের উপর পড়ুক, আমাদের বংশধরদের উপর পড়ুক।"

যুগ যুগ ধরে ধর্মোন্মাদ খৃষ্টান জনতা যখনই ইহুদীদের উপর নির্মমভাবে খুন-খারাবি চালিয়েছে তখনই ব্যঙ্গ করেছে, "তোদের পূর্বপুরুষরা কসম খেয়েছিল না, প্রভুর খুনের দায় তোদের উপর অর্সাবে ? এখন 'আমরা বেকসুর, আমরা মাসুম' বলে চ্যাচাচ্ছিস কেন ?"

অথচ আইনত, ঈসা মসীহের শিক্ষার কসম খেয়ে অবশ্যই বলতে হবে, পিতার পাপ পুত্রে অর্শায় না। এরা বেকসুর।

বেদরদ প্রাক্তন বাস্তুহারা

১৯৩৪-এ ফলস্তীনে গিয়ে দেখি, বাস্তুহীন, ভিটেহারা, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত জর্মন ইহুদীরা লেগে গেছে নূতন করে, কিন্তু নীরবে, লক্ষ লক্ষ নয়া ক্রুশ বানাতে। সর্ব প্রকারের আয়োজন চলছে সঙ্গোপনে। উত্তম উত্তম বাস্তু পাওয়ার পরও এরা বিধি-ব্যবস্থা করে যাচ্ছে, লক্ষাধিক বেকসুর আরবদের কি প্রকারে, কত সুলভ পদ্ধতিতে বাস্তুহারা করা যায়।

এই সব মাসুম চাষাভুষোদের সচরাচর আরব বলা হয়, মুসলিম বলা হয়, কিন্তু আসলে বলা উচিত ফলস্তীনী বা ফলস্তীনবাসী। ইহুদীরা মিসরের দাসত্ব

থেকে বেরিয়ে, ফলস্তীনে এসে একে একে যে সব আদিবাসী উপ জাতিদের জয় করতে করতে ইহুদী-রাজত্ব বসায়, সে সব আদিম বাসিন্দারা ইহুদীদের ধর্ম গ্রহণ করেনি। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কওমের নাম ছিল ফিলিস্তাইন, তাদের রাজত্বের নামছিল ফিলিস্তিয়া। এ রকম আরো ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল অনেক। ফিলস্তিয়া থেকেই পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামের উৎপত্তি। ইহুদীদের ছিল দুটি রাষ্ট্র—জুদেয়া ও ইজরায়েল। এবং আজ প্যালেস্টাইন বলতে আমরা যে ভূখণ্ড বুঝি এই দুই রাষ্ট্র মিলে তার দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। সিনাই বা সীনীন কস্মিনকালেও ইহুদী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

মোদ্দা কথা এই : ইহুদীরা ফলস্তীনের আদিমতম বাসিন্দা নয়। আদিম বাসিন্দারা পরবর্তীকালে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং জেনারেল খালিদ সিরিয়া ও ফলস্তীন জয় করার পর ইসলাম গ্রহণ করে। আজ যখন ইহুদীরা ফলস্তীনকে আপন আদি বাসভূমি বলে হক বসিয়ে প্রাচীনতম বাসিন্দাদের তাড়াতে চায়, তবে কাল দ্রাবিড়রা উত্তর ভারত দাবী করে আর্যদের খেদিয়ে দেবার হক ধরে! যে কোনো রেড ইণ্ডিয়ান ডক্টর কিসিংগারকে দূর দূর করে আপন দেশ থেকে বের করে দিতে পারে। তার আছে সত্যকার হক।

ফি রোজ ঈদ ফি রোজ হালুয়া

জেরুজালেমের সর্বত্র কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। বড় বড় রাস্তার উপর নবাগত ইহুদীরা বসিয়েছে বার্লিন প্যারিস ন্যুইয়র্কী কায়দায় ফেনসি কাফে রেঁস্তোরা। আরব ওগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না, তাকালে সে দৃষ্টিতে থাকে ঘৃণা আর ক্ষোভ। এ সব ইহুদী রেস্তোরাঁয় খাদ্য পানীয়ের দাম যে খুব একটা আক্রা তা নয়। খদ্দের ইহুদী, মালিক ইহুদী। এবং প্রায় সব কটা'ই চলে লোকসানে। তাতে কার কি? সব ইহুদী সাকুল্যে খর্চা, ফুর্তির কড়ি পাচ্ছে মার্কিন জাত-ভাইদের কাছ থেকে। তারা কিন্তু বাস্তু ঘুঘু। ধনদৌলতে ভরা, নৃত্যগৃহ কাবারে, জুয়োর আড্ডা বেশ্যালয়ে আবজাব করছে যে দেশ, সে দেশ ফেলে তারা আসবে কেন এই কাঠখোট্টা প্রাচীনপন্থী প্যালেস্টাইনে—"পুণ্যভূমি' 'পিতৃভূমি, 'আব্রাহামের দেশ' বলে মুখে মুখে যতই হাই-জাম্প লং-জাম্প মারুক না কেন।

আরব জাত গরীব। তাদের রেস্তোরাঁও গরীব। আমিও গরীব।

ঢুকলুম একটা শামিয়ানা ঢাকা রেস্তোরাঁতে। সেটা ছিল রোজার মাস। ইফতার আসন্ন। সে যুগে বেতারের খুব একটা প্রচলন হয়নি। তাই রেস্তোরাঁর লাউড স্পীকারে কুরান-পাঠ আসছে, কাইরো বেতার থেকে, মশহুর 'কারী রেফাতের কণ্ঠে। আমরা আপন দেশে আসন্ন মগরীবের দরমিয়ান ওয়াক্তে সচরাচর কুরান পড়ি না। এরা দেখলুম, চুপ করে বসে আজান না হওয়া পর্যন্ত তিলাওত শোনাটাই পছন্দ করে। দু'চার জন ছোকরা গোছের খদ্দের ফিসফিস করে কথা বলছে। একজন দেখলুম উত্তেজিত মুখে দ্রুতবেগে কি যেন বলে যাচ্ছে আর বারবার খবরের কাগজের উপর আঙুল ঠুকে, খুব সম্ভব তারই বরাত দিচ্ছে। অন্যজনের দৃষ্টি উদাস।

ছেঁড়া, তালি-মারা জোব্বা পরা গোটা চারেক বয় টেবিলে ইফতার সাজাচ্ছে। একজন এসে ফিস ফিস করে শুধালো, খাবো কি? ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি, কাইরোর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হোটেলে যা-খাওয়া হয়, এখানেও টেবিলে টেবিলে সাজানো হচ্ছে তাই। আমি বললুম, যা ভালো বোঝো তাই।

ইতিমধ্যে একজন জোয়ান গোছের লোক আমার সামনের চেয়ারে ধপ করে বসে বয়কে দিলে ইশারা। বয় আসতেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, "সব জিনিসের রেট বাড়িয়েছ তো ফের?" বয় ধবধবে সাদা দাঁত দেখিয়ে মুচকি হেসে বলে "না, এফেন্দম।" লোকটা তেড়ে শুধোলে, "কেন বাড়ালে না? ঠেকাচ্ছে কে? তাই সই। যাবো নাকি ইহুদী রেস্তোরাঁয়?" আমার গলা থেকে বোধ হয় অজানতে অস্ফুট শব্দ বেরিয়েছিল। বোঁ করে চক্কর খেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "বাড়বে না দাম নিত্যি নিত্যি। ঐ ইহুদী ব্যাটারা মুফতের সোনাদানা ওড়াচ্ছে দু'হাতে। ওরা পারে আমাদের সর্বনাশ করতে।" আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম, "ওরা সস্তায় দেয় কি করে?"

"কি করে? অবাক করলেন এফেন্দম, ওদের লাভই বা কি, লোকসানই বা কি? দোকানী ইহুদী, খদ্দেরও ইহুদী!" তারপর যা বললেন সেটা বাংলায় হলে প্রকাশ করতেন একটি প্রবাদ-মারফত: কাকে কাকের মাংস খায় না।

একাধিকবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ডক্টর হেনরি কিসিংগারের প্রতি। ইনি তখনো যুক্তরাষ্ট্রের ফরেন মিনিস্টারের পদ লাভ করেননি, কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও অভাগা বাংলাদেশের লোক তাঁকে চট করে চিনে যায়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই যখন বিশ্বের সর্ব মিলিটারি ওয়াকিফহাল নিঃসন্দেহে বলতে থাকেন, কয়েকদিনের ভিতরেই নিয়াজী পরাজয় স্বীকার করে ফরমানকে ফরমান লেখবার হুকুম দেবেন, তার পূর্বে এবং পরেও ইসলামাবাদের সর্ব-প্রভাবশালী বিদেশী ইলচীরা এক বাক্যে বিশ্বজন তথা জুন্তাকে জানান যে, শেখ মুজীব সাহেবকে মুক্তি না দিলে কোনো প্রকারের স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা নেই, তখনো এই মহাপ্রভু কিসিংগার গোপন বৈঠকে একাধিকবার বিরক্তির সঙ্গে বলেছেন, "না, না, না। 'শেখকে মুক্তি দাও,' ইয়েহিয়াকে এ ধরনের কোনো সুস্পষ্ট স্পেসিফিক নির্দেশ আমরা দিতে পারবো না।"

কোন্ সুচতুর পদ্ধতিতে এই ইহুদীনন্দন শেষটায় শূন্য-মস্তিষ্ক বুদ্দুরাজ মার্কিনের মাথায় সওয়ার হলেন সে-ইতিহাস দীর্ঘ। উপস্থিত সেটা থাক। কিন্তু একটি কথা এখানে বলে রাখা ভালো। ইহুদীরা টাকা ও বিশ্বের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঐক্য-শক্তি দ্বারা মার্কিনের মাথায় কভু যে ডাণ্ডা বুলোয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আড়াল থেকে অদৃশ্য সুতো টেনে পুতুল-নাচ নাচায়, সে-তত্ত্বটা দুনিয়ার লোক জানেন না ; নিরীহ মার্কিন পদচারীরও কূজনে গুঞ্জনে গন্ধে সন্দেহ হয় মনে, বিশেষ করে বোটকা গন্ধ থেকে, ওটা যেন বড্ড অস্নাত ইহুদী ইহুদী বদবোর মত ঠেকছে। কারণ একটি প্রবাদ অনুযায়ী এ সত্য নির্ধারিত হয়েছে, "ফরাসী ও ইহুদীরা নৌকা-ডুবি ভিন্ন জীবনে কখনো গোসল করে না।" সুয়েজ কানালের পাড়েও ইহুদীরা বড্ডই অস্বস্তি অনুভব করতো—পালাতে পেরে বেঁচেছে।

তা সে যাই হোক, মার্কিন ইহুদীদের তাগত কতখানি প্রচণ্ড সেটা উত্তম-রূপে অবগত আছেন মার্কিন রাজনৈতিকরা। এডওয়ার্ড কেনেডির প্রতি বাংলা-ভারতের অনেকেই শ্রদ্ধা পোষণ করেন, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় এ দেশের স্বাধীনতা স্পৃহার সমর্থন জানিয়ে নিক্সনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। পাঠক শুনে বিস্ময় ও বেদনা বোধ করবেন বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তিন দিন যেতে না যেতেই সেই কেনেডি, আমার জানা মতে, 'গয়'-দের মধ্যে সর্বপ্রথম, মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন ইজরায়েলকে

যুদ্ধের এ্যারপ্লেন দিয়ে সাহায্য করেন। তার প্রথম কারণ, তিনিই ইজরায়েলের প্লেন নাশের অবস্থাটা তড়িঘড়ি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় কারণই আসল এবং মোক্ষম। ১৯৭৬-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি উমেদার, এবং আমার জানা মতে, অন্ততঃ এ শতাব্দীতে, ইহুদী-বৈরী কোনো ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। কেনেডি বেলাবেলিই ইহুদীদের সন্তুষ্ট করে রাখতে চান।

ইজরায়েল! হিসাব দাও!

পাঠক কিন্তু তাই বলে এক লম্ফে হিটলারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে যাবেন না, তামাম মার্কিন মুল্লুক চালাবার কুল্লে কলকাঠি ইহুদীদের হাতে। মোটেই না। ইহুদীকুল শক্তি-উপাসক নয়। তারা করে লক্ষ্মীর উপাসনা। মার্কিন পলিটিক্‌সে তারা শক্তিধর হতে চায় না। যদি কখনো তাদের প্রত্যয় হয়, যে অমুক প্রেসিডেন্ট হলে তাদের টাকা কামাবার পথে কাঁটা হবেন, তবেই তারা কুল্লে ধন-দৌলত দিয়ে সাহায্য করে তাঁর দুশমনকে—কিন্তু গোপনে। মাত্র একবার তারা ভুল করে শক্তির পথে নেমেছিল। জাত-ভাইদের জন্য ফলস্তীনে সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র গড়ার কুবুদ্ধি তাদের মাথায় ঢোকে, এবং গত পঞ্চাশটি বছর ধরে তারা যে কি পরিমাণ মাল দরিয়ায় ঢেলেছে সেটা জানে একমাত্র তারা আর জানেন জেহোভা। এইবারে তার হিসেব নেবার পালা এসেছে! ম্যাডাম গোল্ডা মেইর, মশে দায়ান, আবা এবানের টুঁটি চেপে ধরে মার্কিন ইহুদীরা শুধোবে, "হিসেব দেখাও, টাকাটা গেল কোথায়! কে মেরেছে কত? এখন কুল্লে ইহুদী রাষ্ট্রটা যে ডকে উঠতে চললো তার জন্য দায়ী কে?"

কভু গোপনে!

কিন্তু এটা বাহ্য। আসল গরদিশে পড়েছেন বাবাজী কিসিংগার। মার্কিনদের হনুকরণ করে (এপিং করে) নাম পর্যন্ত বদলালেন, হাইনরিষ কিসিংগার থেকে হেনরি কিসিংগারে! আরো কত কি না করলেন, "কেরেস্তান"দের সঙ্গে একদম লাইলি-মজনূনের মত দুই দেহে এক প্রাণ, হরিহরাত্মা হয়ে যেতে। ওদিকে ধাপ্পা দিলেন বিশ্বযুদ্ধ সব্বাইকে,—ইহুদীদের অবশ্যই বাদ দিয়ে—তিনি প্রভু নিক্সনের উপদেষ্টা রূপে চারটি বৃহৎ বিশ্বশক্তির সঙ্গে গুফতো-গো করেন মাত্র :

তাঁরা রুশ, চীন, জাপান আর পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ (ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড জর্মনি গয়রহ)। মধ্যপ্রাচ্য? আজ্ঞে না। ওটা ডীল করছেন স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী হিজ একসেলেনসি রজার্স। ভাবখানা এই, "আমি ইহুদীর বেটা। আরব ইজরায়েলের ফ্যাসাদে আমার নাক গলানোটা কি নিরপেক্ষ, সুবিবেচনার কর্ম হবে?"

তাই দেখা গেল, কিসিংগার যখন ক্ষুদ্র-অসাধুতা ("পেটি এ্যাণ্ড ভিজনেস্ট" —ফরেন আপিসের একাধিক উচ্চ কর্মচারীর মতে) পদ্ধতিতে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীত্ব ছিনিয়ে নিলেন (গ্র্যাবড) তখন মিসরের জনৈক সম্পাদক, অস-সঈদ ইহসান আবদুল কুদ্দুস বললেন, "আশা ছাড়বো কেন? ভেবে দেখুন, ফীল আখির— আফটার অল—বছরের পর বছর ধরে আমরা মিঃ রজার্সের সঙ্গে লেন-দেন করার পর আখেরে আবিষ্কার করলুম, তিনি ক্লীব—শক্তিধর তাঁর পিছনে গদাধর কিসিংগার!" বিগলিতার্থ তা'হলে দাঁড়ালো এই, আরবরা বুদ্দু। কিসিংগারই কলকাঠি নাড়িয়েছেন ইজরায়েলের হয়ে, শিখণ্ডী ছিলেন রজার্স। এটাকে যদি ধাপ্পা, প্রতারণা না বলে তবে বজ্জন দয়া করে শব্দ দুটোর সংজ্ঞা জানাবেন কি?

কভু হাটের মধ্যিখানে!

এই কি তার শেষ? কিসিংগার রুশের সঙ্গে দোস্তী জমালেন স্বয়ং খোলাখুলি-ভাবে। হঠাৎ দেখি, ইয়াল্লা, হুড়হুড়িয়ে বানের জলের মত ইজরায়েলের পানে 'রাশ' করেছে রুশের ইহুদী-পাল! এরা যে ননী-মাখনে পোষা ইজরায়েলীদের চেয়ে হাজার গুণে সখৎ মোকাবিলা করতে পারবে আরবদের, সেটা স্বীকার করেছেন ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু জাঁদরেলগণ। চীন তো চটে গিয়ে রুশকে করেছে এর জন্যে দায়ী। কিসিংগারকে ছেড়ে দিয়ে কথা কইল কেন, সে আমি জানিনে।

সরল প্রশ্ন

কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সেবক, এ মূর্খ, লেখাটি আরম্ভ করেছে সেটি ভিন্ন, কিন্তু উপরের বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-বিজড়িত। আমি নাদান, কিঞ্চিৎ এলেম সঞ্চয় করতে চাই আপনাদের কাছ থেকে।

(১) আশা করি সবাই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশ বিশ্ব সংসারে অসাধারণ

শক্তিশালী এমন একটা রাষ্ট্র নয় যেখানে কোনো মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিজকে এ দেশের প্যারা করতে চাইবেন। আমার প্রশ্নটা পরে আসছে।

(২) কত রাজা কত প্রেসিডেন্ট, কত প্রধানমন্ত্রী নিজ নিজ পদ গ্রহণ করার সময় নিত্যি নিত্যি শপথ নেন। তার ক'টা ফোটো এই গরীব ঢাকার দৈনিকে বেরোয়, বুকে হাত দিয়ে বলুন তো।

(৩) তা'হলে প্রশ্ন, হঠাৎ করে মিঃ কিসিংগার—রাজা না, প্রেসিডেন্ট না, এমনকি প্রধানমন্ত্রী না—ফরেন মিনিস্টারী নেবার সময় যে-শপথ গ্রহণ করেন তার ছবি ঢাকার কাগজে কাগজে বেরুলো কেন? নিশ্চয়ই ছবিটি মিঃ কিসিংগার যে-ফরেন আপিসের বড় সাহেব হলেন, সে-আপিসের ঢাকাসহ শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে। তা' হোক, কিন্তু প্রশ্ন, এই ছবিটাই বিশেষ করে কেন?

(৪) উপরের প্রশ্নটি যত না গুরুত্ব-ব্যঞ্জক, তার চেয়ে মোস্ট ইম্পরটেন্ট, মিঃ কিসিংগারের সম্মানিতা মাতা যে বাইবেল হাতে করে শপথের সময় দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা কে, কারা, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন? কত লোক কত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে, বা কোনো ধর্মগ্রন্থ না নিয়ে শপথ করে, কই, সেটা তো আজ অবধি কোনো খবরের এজেন্সি বা ইনফরমেশন সার্ভিস চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকই বাইবেলের নামে গদগদ এ কথাও তো কখনো শুনিনি।

(৫) মিঃ কিসিংগার ইহুদী। বাইবেলের প্রথম অংশ, যার নাম "ওলড টেস্টামেন্ট" সেটা ইহুদীদের সম্মানিত ধর্মগ্রন্থ—খৃষ্টানদেরও। কিন্তু তার দ্বিতীয়াংশই আসলে খৃষ্টানদের পরম পুজ্য "নিউ টেস্টামেন্ট"—যাতে আছে প্রভু যীশুর জীবনী, তাঁর খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বিবরণ, এবং আছে তাঁকে যে ইহুদীরা ক্রুশে চড়িয়ে খুন করে তার করুণ কাহিনী। মিঃ কিসিংগার (এবং তাঁর মাতা) কি এই কাহিনীর "পবিত্রতায়" বিশ্বাস করেন যে এটিকে স্পর্শ করে তিনি শপথ নিলেন? আমি যতদূর জানি, ইহুদীরা এই "নিউ টেস্টামেন্টে" বিশ্বাস করেন না। অতি অবশ্যই ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তোওরাতে (তওরীতে) "নিউ টেস্টামেন্টের" স্থান নেই।

(৬) তবে কি ফোটোর বাইবেল খাস ইহুদী-বাইবেল? আমাদের জানা মতে, সে গ্রন্থে থাকে শুধু "ওলড টেস্টামেন্ট।" তাই যদি হয়, তবে "বাইবেল, বাইবেল" বলে সেটা অতখানি প্রচার করা হল কেন? ঢাকা কলকাতার জনসাধারণ তো বাইবেল বলতে ওলড এবং নিউ, দুইয়ে গড়া বাইবেলই বোঝে,

সেই কেতাবদ্বয়ের সম্মিলিত গ্রন্থই দেখেছে। যাঁরা ফোটোর সঙ্গে ক্যাপশনটি বিতরণ করেছেন তারা ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে ভালো হত না? "বাইবেল" শব্দটিও মূলত গ্রীক বলে ইহুদীরা ব্যবহার করেন বলে শুনিনি। তাঁরা তোওরা, তালমুদ ইত্যাদি বলে থাকেন। হয়তো নিতান্ত 'গয়'দের উপকারার্থে মাঝে মাঝে বাইবেল বলেন।

(৭) ইহুদী কিসিংগারের পক্ষে কি বাধ্যতামূলক ছিল, বাইবেল স্পর্শ করে, শপথ নেবার? কাল যদি মুসল্লী মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) আমেরিকায় মন্ত্রী হন, তবে তাঁকেও কি বাইবেল ছুঁয়ে কসম নিতে হবে?

(৮) তবে কি ডঃ কিসিংগার ও সম্মানীয়া মাতা সনাতন ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করেছেন? এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব—কিসিংগার চরিত্র যতখানি বুঝতে পেরেছি তার পর।...এসব বাবদে কিঞ্চিৎ এলেম হাসেল হলে উত্তম আলোচনা করা যাবে। যাঁরা এতখানি পয়সা খর্চা করে মুফতে ফটো বিতরণ করলেন, তাঁরা দু'পয়সার কালি-কাগজ মারফৎ সত্যজ্ঞান বিতরণ করবেন না, এও কি সম্ভব? মুফতে থোড়া বখশিশ দিয়ে বেতটার পয়সা ওনরা দেবেন না??

বার্লিনে

১৯২৯-এ আমি বার্লিন যাই। সে যুগে বার্লিন এবং অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা ছিল ইহুদী জগতের প্রবীণতম দুই কেন্দ্র। ইহুদী বৈরী হিটলার এবং তাঁর গুরু-মারা চেলা বৈরী-প্রধান গ্যোবেলস তখনো রাষ্ট্রশক্তি পাননি, এবং তাঁদের শক্তিকেন্দ্র ছিল বাভারিয়া প্রদেশের ম্যুনিকে। তবু মাঝে-মাঝে বার্লিনের রাস্তায়, পাবে, মিটিঙে, নাৎসি আর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে হাতাহাতি মারামারি হত। তাছাড়া মোকায় পেলে মশহুর কোনো নাৎসি-বৈরীকে পেলে তাকেও দু'ঘা বসিয়ে দিত, খুনও করেছে। এস্থলে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দি, ফ্রান্স জর্মনিতে ইহুদীদের এক বৃহৎ অংশ নিজেরা প্রগতিশীল বলে, প্রগতিশীল কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিত। কম্যুনিষ্ট প্যাদাতে পারলে নাৎসিদের ছিল ডবল আনন্দ। বহুত ক্ষেত্রে ফালতো রিসক না নিয়ে একাধারে কম্যুনিষ্ট ইহুদী দু'জনকেই ঘায়েল করা যেত। যে কারণে এ দেশের হিন্দুকে খতম করে ইয়েহিয়া পেতেন ডবল সুখ—একাধারে হিন্দু এবং বাঙ্গালী, দুই দুশমনের জন্য লাগতো মাত্র একটা বুলেটের খর্চা।

য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর টেবিলে নাৎসিদের কথা বড় একটা উঠতো না। ছাত্রদের ভিতর তখন কম্যুনিষ্টদের ছিল প্রাধান্য। এবং স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে ইহুদীদের ছিল উচ্চাসন। আমি যে ওদের সঙ্গেই গোড়ার থেকে ভিড়ে গিয়েছিলুম তার কারণ কম্যুনিষ্টরা আপন "ধর্মে" দীক্ষা দেবার জন্য নবাগতজনকে অভ্যর্থনা জানায় আর ইহুদীরা শত পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় মেহমানদারী গুণটি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে ইজরায়েল ব্যত্যয়। কিংবা হয়তো যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার সময় অখৃষ্টান যাকে পেয়েছে তার সাহায্য পাবার আশায় তার সঙ্গে যেচে গিয়ে কথা বলেছে। অবশ্য এটা স্মরণে রাখতে হবে ইহুদী জাত যেখানে গিয়েছে, সেখানেই কিছু না কিছু মিশ্রণের ফলে এখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বলা প্রায় অসম্ভব খৃষ্টান জর্মন কে, আর ইহুদী জর্মনই বা কে। এবং নাম থেকেও বলা সুকঠিন কে কোন জাত বা ধর্মের।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহুদী-শাস্ত্র চর্চা

১৯৩০-এ হিটলার হঠাৎ, কি কারণে কেউ জানে না, পার্লামেণ্টে অনেকগুলো সীট পেয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে আমি চলে এসেছি বন শহরে। ছোট শহর বন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারটি জর্মনীর ভিতরবাইরে সর্বত্র সুপরিচিত। সেখানে আরবী, সংস্কৃত ও হীব্রু চর্চা হত প্রচুর। সেই সূত্রে ডজনখানেক ইহুদী ছাত্র ও পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল তো বটেই, দু'তিন জনার সঙ্গে রীতিমত হৃদ্যতাও হয়ে গেল। এদের একজন ছিলেন সেই সুদূর রুশ দেশেরও দূর প্রান্ত জর্জিয়ার লোক। ভারী আমুদে, পরিণত বয়স্ক, ছাত্র সমাজের মুরব্বী। ওদিকে ইহুদী ধর্মতত্ত্বের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করেছিলেন বলে (অর্থাৎ তিনি রাব্বী পণ্ডিত-পুরোহিতের সমন্বয়) "ওল্ড টেস্টামেণ্টের" প্রামাণিক সংস্করণের নতুন প্রকাশ নিয়ে দুনিয়ার যত প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মধ্যে দিন-যামিনী আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকতেন। একদিন আরবীতে লেখা "আজাব উল-কবর" (মৃতজনকে গোর দিয়ে চলে আসার পর ফিরিস্তা এসে তাকে তার ঈমান সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করেন তার বিবরণী) পড়ে আমার মনে হল, ইহুদীদের "তালমুদ" গ্রন্থে এর উল্লেখ থাকাটা অসম্ভব নয়। আমার হীব্রু বিদ্যে মাইনাস ডডনং। জর্জিয়ার রাব্বীর কাছে গিয়ে প্যাসেজ দেখাতেই তিনি চোখ দুটো বন্ধ করে চেয়ারের হেলানটায় মাথাটা ফেলে

ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বিড় বিড় করে হীব্রু শাস্ত্র আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি—তাল-মুদ তিলাওতের পালা আর সাঙ্গ হয় না। কুরান শরীফের শবীনা খৎম-ই এক ঠায় বসে এ জিন্দেগীতে আদ্যন্ত শোনার সওয়াব হাসিল করতে পারেনি এই বদ-কিস্মৎ গুনাগার। আর এই তালমুদ গ্রন্থটি ইটের থান মার্কা পাক্কা চল্লিশটি ভলুমের নিরেট মাল। সওয়াব ভী নদারদ, কারণ তালমুদ কেতাব পাক তওরিতের অংশ নয়।…আখেরে জেহোভার রহমৎ নাজিল হল। হঠাৎ থেমে গিয়ে এক লম্ফে পেড়ে আনলেন এক খণ্ড তালমুদ। পাশের চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে "হিম্বৎ হা করব" (আমার সঠিক নাম আজ আর মনে নেই) অনুচ্ছেদটি পড়তে আরম্ভ করলেন, আমার হাতে আরবী টেকসটটি তুলে দিয়ে। এবং হুবহু এক্কেবারে আমাদের মক্তবের ছাত্রদের মত ঘন ঘন দুলে দুলে আর সুর করে করে। আর মাঝে মাঝে ঠিক মক্তবের বাচ্চাটার মত মাথা ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়ে সুর করেই বলেন "হল না," মেরামত করে ফের এগোন দ্রুততর গতিতে।

আমি তো অবাক। কবে কোন যুগে, ছেলেবেলায় আপন গাঁয়ে দেখেছি এই দৃশ্য ! আর সেই দৃশ্য জর্জিয়ার তিফলিস থেকে এখানে এসে ফের হাজির ! হাঁ, ওখানেও একদা আরবী তুর্কী ফার্সীরও প্রচুর চর্চা হত। শুধু একটা অনুষ্ঠানে ফারাক ছিল; রাব্বীকে বললুম, " 'হল না' বলার সঙ্গে আমাদের তালিব-ই-ইলম চট করে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নেয়, চাবুক হাতে মৌলবী সাহেব শুনতে পেয়ে তেড়ে আসছেন কিনা।" সদানন্দ পণ্ডিত ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। হাসি আর থামতেই চায় না।

গোপন ইহুদী রেস্তোরাঁ

এ কাহিনী এতখানি বাখানিয়া বলার উদ্দেশ্য আমার আছে। ১৯৩২-এ দেশে ফিরে ফের বন শহরে গেলুম ৩৪-এ। রাব্বীর সঙ্গে দেখা হল না। ভাবলুম হয়তো বা হবু ইহুদী রাষ্ট্র ইজরায়েলে চলে গিয়েছেন। এ রকম সুপণ্ডিত রাব্বী পুণ্যভুমিতে যাবেন না তো যাবার হক্ক ধরে কে? তাই ভারি খুশী হলুম, চিন্তিতও হলুম ৩৮-এ তাঁকে ফের বন শহরের স্টেশনের কাছে দেখে। হিটলার তখন এমনিই বেধড়ক দাবড়াতে আরম্ভ করেছে যে ইহুদীরা জর্মনী ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করেছে দলে দলে—একদা যে-রকম মিসর ছেড়ে তুরি সীনীনে পৌছেছিল। ঐ সময়েই হের ডক্টর কিসিংসার—যিনি তরুণ দিন চোখ

রাজিয়ে আরব নেশনকে শাসিয়েছেন, "এখন পাঠাচ্ছি স্রেফ অস্ত্র-শস্ত্র (জাত-ভাইকে), দরকার হলে পাঠাবো সেপাই জাঁদরেল,"—সেই, তখনকার দিনের চ্যাংড়া হাইনরিষ ডাকনাম হাইনৎস কিসিংগার পড়ি মরি হয়ে জর্মনী ছেড়ে অন্যকার মিলিটারি কণ্ঠটি খামুশ রেখে, চড় চড় করে বীরগর্বে পালান মার্কিন মুল্লুকে।......রাব্বী আব্রাহাম আমাকে জাবড়ে ধরে নিয়ে উঠলেন একটা বাড়ির দোতলায়। ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখি ইহুদী রেস্তোরাঁ। কারণ সামনেই ছোট্ট একটা টেবিলের উপর গোটা দশেক ছোট কালো কাপড়ের টুপি—নিতান্ত কুণ্ডলিসুদ্দু মাথার খাপরিটা ঢাকা যায় মাত্র। ইহুদীরা অনাবৃত মস্তকে ভোজন বা ভজনালয়ে প্রবেশ করে না। আম্মো একটা পরে নিলুম। সুন্নৎ।

মাথমে ভাজা মাছ এল। ইহুদী শরিয়তে মাছ তেলে ভাজতে নেই। আমি বললুম, "বিসমিল্লা করুন।" তিনি তাই করলেন। কুশলাদি সমাপনান্তে আমি আশ-কথা পাশ-কথা দু'চারটি বলে শুধালুম, "পুণ্যভূমিতে যাবেন না?"

তাঁর মাথা আমার কানের কাছে এনে অতি চুপেচুপে বললেন, "আমাকে তারা পছন্দ করবে না। কিন্তু এখানে না, রাস্তায় কথা হবে।"

আহারাদি ছ'বছর আগে ছিল ঢের, ঢের ভালো।

টুপি ফের টেবিলে রেখে রাস্তায়, তারপর সেমিনারে। পূর্ববৎ গুরুশিষ্যের মত মুখোমুখি হয়ে বসার পর নিজের থেকেই বললেন, "আমি রাব্বী। আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, শাস্ত্র মেনে চলি। ইজরায়েল যারা গড়ে তুলছে তাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বব্যঞ্জক সর্বপ্রথম সমস্যাতেই তারা যে পথে চলেছে সেটা ভুল পথ। আমার ব্যক্তিগত মত নয়। খুলে বলছি।

প্যালেস্টাইন থেকে চিরতরে বিতাড়িত হওয়ার পূর্বে ইহুদীরা পুণ্যভূমিতে তিনবার সশস্ত্র সংগ্রাম করে। প্রতিবার তারা নির্মমভাবে পরাজিত হয়। একবার বাবিলনের রাজা তো আক্রোশের চোটে তাদের ছেলে-বুড়ো-কুমারী সধবাদের বিরাট এক অংশ দাসরূপে টেনে নিয়ে গেলেন প্যালেস্টাইন থেকে সেই দূর বাবিলনে—সমস্ত সিরিয়া মরুভূমির উপর দিয়ে। বার বার জেনে শুনে, কারণে-অকারণে কখনো বা পরের ওসকানিতে তারা বিদ্রোহ করে শুধু যে নিজেদের পার্থিব সর্বনাশ ডেকে এনেছে তাই নয়, ঐতিহ্যগত ধর্মের মারফৎ তারা যেটুকু সভ্যতা সংস্কৃতি গড়েছিল সেটারও পূর্ণ বিকাশ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রতিবার গোটা জেরুজালেম শহরটাকে পুড়ে খাক করে দিয়েছে,

হাজার হাজার নারী পুত্রহীন, স্বামীহীন করেছে তারা, যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, করার মত শক্তি তাদের আদৌ ছিল না।

তাই ইহুদীদের প্রফেটরা ধর্মগ্রন্থে বারবার সাবধান করে দিয়েছেন, সশস্ত্র সংগ্রাম লিপ্ত হওয়া তোমাদের পক্ষে পাপ, মহাপাপ!

'হোম' বানাতে গিয়ে প্যালেস্টাইনে এই নয়া ইহুদীরা আবার ধরেছে অস্ত্র আরবদের বিরুদ্ধে। বার বার আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাব্বীরা তাদের সম্মুখে শাস্ত্র খুলে তাদের মানা করেছেন; তারা শোনেনি!

এখন বেশীর ভাগ আর মুখ খোলেন না।

আমি রাব্বী। আমি বিশ্বাস করি শাস্ত্রের বচন। আরবদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকা ভিন্ন এদের অন্য কোনো পন্থা নেই। কিন্তু আমার কথা শুনবে কে?"

—শেষ—